সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৪ ❑ পঞ্চম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ ১০ টাকা

মন্থন

সাময়িকী

রেস্থ নজরে পৃ-২
পুর : কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি পৃ-৩

ক্ষাৎকার :
❑ উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মণিপুরের সমস্যা পৃ-৯

নোরমা হত্যার প্রতিবাদ
আন্দোলনের দিনলিপি পৃ-১৫
নোরমার ধর্ষণ এবং ময়না-তদন্ত পৃ-২০

ক্ষাৎকার :
❑ আপুনবা লুপ-এর প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ পৃ-২১
❑ মনোরমা হত্যা এবং তদন্ত কমিশন পৃ-২৩

মণিপুরী সমাজের কাছে পেবম চিত্তরঞ্জনের
অন্তিম আবেদন [সুইসাইড নোটের অংশ] পৃ-২৪

নোরমার অ্যারেস্ট মেমোর প্রতিলিপি পৃ-২৫

মণিপুরে সামরিক বাহিনীর হাতে
মানবিক অধিকার খর্ব হওয়ার চিত্র [১৯৮০-২০০৪] পৃ-২৬

দেখানো তদন্ত — বিচারের নামে প্রহসন পৃ-৩০

ইথেল
মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী স্বদেশি বিপণন কেন্দ্র পৃ-৩১

সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের কয়েকটি ধারা পৃ-৩২

রাষ্ট্র, সিভিল সোসাইটি এবং মণিপুরী কৌমসমাজ পৃ-৩৩

মারূপ
মণিপুরী উপত্যকার সামাজিক সমবায় কথা পৃ-৩৫

চিঠিপত্র :
১. লেনিন স্তালিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ পৃ-৩৬
২. মুর্শিদাবাদ থেকে মণিপুর পৃ-৩৬
৩. উন্নয়নের সূত্র ধরে পৃ-২

মণিপুরের কৌমজীবনের ছবি

সেনাবাহিনীর বীরপুরুষেরা
এসো
আমাদের মাংস খুবলে খাও
আমাদের ধর্ষণ করো
হত্যা করো

তোমাদেরও তো বৌ-ছেলেপুলে রয়েছে
এমন ব্যবহার তো পশুরাও করে না

মনে রেখো
আমরা প্রত্যেকে মনোরমার মা

তেরছা নজরে

তথাগত

চক্কর

সেদিন তর্কটা বাধল গণতন্ত্র বনাম গোঁড়া আর জেহাদি ইসলাম নিয়ে। রিপোর্টার সায়েব ভারিক্কে কেতায় বিষয়টা তুললেন এইভাবে : 'আজকের এই বিশ্বজোড়া সংঘর্ষে দুটো শিবির, দুটো পক্ষ। এক পক্ষে, গণতন্ত্র আর মুক্ত দুনিয়া; অন্য পক্ষে, জেহাদি বা সন্ত্রাসী ইসলাম। আপনারা কিন্তু খেয়াল রাখবেন— গোঁড়া বা মৌলবাদী ইসলাম আর জেহাদি বা সন্ত্রাসী ইসলাম এক নয়; আগাপাশতলা আলাদা।'

গালচেওয়ালা : 'বাস্তবে ওই তফাতটা কি ঠিক? আজ যে গোঁড়া, কাল সে সহজেই জেহাদি বনে যাচ্ছে— এ তো হরদম দেখছি। আর জেহাদি মাত্রেই তো কট্টর গোঁড়া। গোঁড়া ইসলামের ছাতাওয়ালা যত সংস্থা দেখি, প্রায় সবই তো ভেতরে ভেতরে জঙ্গি, জেহাদি।'

আড্ডায় হাজির ছিলেন আবদুল আহাদ। তিনি বলে উঠলেন, 'না, না, অত সরল নয়। আরও ঢের ঘোরপ্যাঁচ আছে। ওই দুই পক্ষ ছাড়াও আছে : নক্‌লি গোঁড়া, নক্‌লি জেহাদি। আর, আস্‌লি গণতন্ত্রীর পাশাপাশি : নক্‌লি গণতন্ত্রী।'

ইনজিনিয়ারিং শ্রমিক : 'ঠিক বলেছেন আপনি। আর আপশোশের কথা এই : পুঁজির মিডিয়া ইসলামের যে-প্রতিমূর্তি বানাচ্ছে, ছড়াচ্ছে, সেটাকেই জেহাদি ইসলামওয়ালারা গোগ্রাসে খাচ্ছে, গিলছে। আর— হয়তো অজানতে— সেই আদলেই নিজের প্রতিমূর্তি খাড়াও করছে, জাহিরও করছে। কিছুতেই বুঝছে না, এতে পুঁজিরই পোয়া বারো।'

আবদুল আহাদ : 'আদত প্রশ্ন হচ্ছে— এই ধ্বংস আর হিংসার 'চক্করে আস্‌লি পাপী কে?'

কুসুম কুসুম চায়ে লম্বা শেষ চুমুক দিয়ে মোল্লা নাসিরুদ্দিন বললেন, 'আস্‌লি পাপী? সে এক শক্ত ধাঁধা।

'এই তো সেদিন, কৃষ্ণপক্ষের দুপুর রাতে আমি বোখারার রাস্তায় রাস্তায় আলো হাতে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছি। রোঁদের পাহারাওয়ালা আমায় দেখে বললে, "কী মোল্লা? এই রাত বিরেতে রাস্তায়? হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে খুঁজছেনটা কী?"

'আমি বললুম, "দ্যাখো না কী জ্বালা! ব্যাটাচ্ছেলে ঘুম আমারই দু চোখের ভেতর থেকে শট্‌কে গিয়ে ভোল পালটে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল, খুঁজতে খুঁজতে জান হয়রান।" পাহারাওয়ালাটি হো হো করে হেসে উঠল।

'আস্‌লি পাপী ঠিক যেন ওই ফেরারি ঘুম। আলো হাতে বাইরে— হেথায়, হোথায়— যতই ঢুঁড়ে মরুন, কোথ্‌থাও ওর হদিশ মিলবে না।'

কার্পাসচাষী : 'আবদুল আহাদ সায়েব কিন্তু লাখ কথার এক কথা বলেছেন : "চক্কর"। গণতন্ত্র আর জঙ্গি ইসলামের এই-যে সংঘর্ষ, এ তো সত্যিই একটা চক্কর— মার আর পালটা মারের চক্কর। যেটা ক্রমাগত ঘুরছে, ঘুরছে তো ঘুরছেই। এই অন্তহীন চক্কর থেকে বেরুনোর পথটা কী? আপনি কী বলেন, মোল্লা?'

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের কৌতুক-হাসিতে জ্বলজ্বলে চোখদুটো একটু যেন গোল গোল হয়ে উঠল। তিনটে ভাঁজ পড়ল দুই ভুরুর মাঝখানে। সামনের চিনার গাছটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি মিনিটখানেক একটি মৌলিক স্বর গুনগুন করে ভাঁজলেন; আওয়াজটা শোনাল গা-ছমছম রাতে হুতুম প্যাঁচার গম্ভীর ডাকের মতন: হুউম্। স্বরসাধনা থামিয়ে তিনি বললেন, 'ওই চক্করে ঢুকে পড়ার রাস্তা বিস্তর; কিন্তু বেরুনোর ঠিকানা তো কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। মুশকিলটা কী জানেন? রাস্তা খুঁজে বার করতে হয় নিজেকেই। সেখানে সে একলা পথিক; অথচ বহু মানুষ— একটা লোকসমাজ— কাতারে কাতারে একসঙ্গে না-হাঁটলে, ওই রাস্তাটা তৈরি হয় না।'

তারপর, কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু করলেন, 'আরেকটা গল্প বলি। শুনুন। একদিন ভর সন্ধেবেলায় আপন মনে রাস্তায় হাঁটছি। এক হামলাবাজ একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে আমার গালে, বেমক্কা— হঠাৎ ভারি এক হাতুড়ির মোক্ষম ঘা। কোনওরকমে টাল সামলে যেই ওই মাস্তানটার মুখোমুখি রুখে দাঁড়ালুম, সে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে বললে, "জনাব, আমার একটা সওয়াল আছে। আগে সেটার জবাব দিন। তারপর, আমায় পালটা মারধোর— যা হয়— করবেন। আমি আপনার গালে ঘা মারলুম আর তক্ষুনি একটা থাপ্পড়ের আওয়াজ উঠল। এখন, আপনিই বলুন, জনাব, ওই আওয়াজটার কারণ কী? আমার হাত, না, আপনার গাল?"

'আমি বলি, "থাপ্পড়ের চোটে আমার গালও জ্বলছে, ব্রহ্মতালুও জ্বলছে। এখন আমার অত সূক্ষ্ম ভাববার ফুরসত কোথায়? আপনিই তো মারনেওয়ালা। আপনিই বরং ঠাণ্ডা মাথায় ওই জবাবটা ভাবুন না।"

চিঠিপত্র

৩. উন্নয়নের সূত্র ধরে

সম্পাদক,
'মন্থন সাময়িকী'

'উন্নয়ের সূত্র ধরে' আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে দীপেনবাবু সৌরীন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যেভাবে আলোচনা করলেন তাতে এটা স্পষ্ট যে, তিনি আগে থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য ঠিক করে এসেছিলেন। ফলত এই আলোচনা থেকে কোনকিছুই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, তিনি তাঁর অবস্থানে অনড় থেকেছেন। তিনি তাঁর অবস্থানে এতটাই অনড় যে সেখানে ভিন্ন স্তর থেকে কোন প্রশ্ন তিনি ওঠাতে দিতে রাজী নন। মূলত তিনি যে স্তরে অবস্থান করছিলেন তা ভিন্ন যে আলোচনায়, চিন্তায় আর কোন স্তর থাকতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অবহিত নয়। ফলে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের অংশটুকু এই আলোচনায় একেবারেই অবান্তর হয়ে পড়েছে। সৌরীনবাবুর বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দীপেনবাবু ঐ স্তরের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছেন।

আমার মনে হয় সৌরীনবাবু বলতে চেয়েছেন যে, আমরা যে ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই (পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ইত্যাদি) নিজেকে যুক্ত করিনা কেন, যদি প্রতিমুহূর্তে আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমীক্ষা না করি তাহলে আমাদের নিজেদের কাছেই আমাদের ব্যক্তিস্বরূপ অধরা থেকে যাবে। আমাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে যাবে— সেক্ষেত্রে আমাদের কর্ম তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবে। এ প্রসঙ্গে সৌরীনবাবু খুব সুন্দরভাবে বেদান্ত দর্শনের উপস্থাপনা করেছেন।

দর্শনের প্রয়োজন এইখানেই, আমরা যদি কোনকিছু সঠিকভাবে জানতে চাই, তার স্বরূপ জানা প্রয়োজন, আর স্বরূপ জানতে গেলে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির

... পরবর্তী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়

মণিপুর : কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি

মণিপুরের আয়তন ২২,৩২৭ বর্গকিমি। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যের উত্তরে নাগাল্যান্ড, পূর্বে মায়ানমার, দক্ষিণে মায়ানমার ও মিজোরাম এবং পশ্চিমে আসাম। মণিপুর উপত্যকার আয়তন ১,৮১৩ বর্গকিমি। মণিপুরের জনসংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মিতেই কৌমের মানুষ, এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য উপজাতিভুক্ত। মণিপুরীদের অধিকাংশই হিন্দু ধর্মাবলম্বী, প্রায় ৫৫ শতাংশ; ৩২-৩৩ শতাংশ ক্রিশ্চান এবং ৭-৮ শতাংশ মুসলমান। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, মিতেই এবং পাঙ্গান বা মিতেই মুসলমান হিশেবে ভাগ করা যেতে পারে। মিতেই কৌমের মধ্যে রয়েছে ক্ষত্রিয়, রাজকুমার ও তফসীলি সম্প্রদায়ভুক্ত লই জাতগত ভাগ। পার্বত্য তফসীলি উপজাতিদের মধ্যে রয়েছে আইমল, আনাল, আঙ্গামি, চিরু, চোথে, গাঙ্গতে, হমার, কাবুই, কাচা নাগা, কোইরাও, কোইরেঙ, কোম, লামঙ্গাগ, মাও, মারাম, মারিঙ, আনি মিজো (লুশাই), মনসাঙ, ময়োন, পাইতে, পুরুম, রালতে, সেমা, সিমতে, সাহতে, তঙখুল, থাডৌ, ভাইফেই, জৌ উপজাতিভুক্ত মানুষ। মণিপুরের সরকারি ভাষা মণিপুরী এবং ইংরেজি। মণিপুর পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে ১৯৭২ সালে। মিতেই লিপিতে মণিপুরী ভাষাও অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাচীন মিতেই লিপি বা হরফের পরিবর্তে বাংলা হরফের প্রচলন হয়েছে প্রায় দুশো বছর আগে। ইদানীং মিতেই লিপি পুনরায় প্রবর্তন করার একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মণিপুরের ৮৫ শতাংশের বেশি মানুষ বাস করে ১৯৪৯টি গ্রামে, ১৫ শতাংশেরও কম মানুষ বাস করে সাতটি শহরে। রাজধানী শহর ইম্ফলের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ নিয়ে ৮ লক্ষের বেশি মানুষ বসবাস করে। আয়তনে পার্বত্য এলাকার তুলনায় উপত্যকা অনেক ছোটো হলেও এখানে ৭৫ শতাংশের বেশি মানুষ বসবাস করে। উপত্যকার জীবনযাত্রা কৃষিপ্রধান। ধান হল প্রধান ফসল। মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ডিসেম্বরের প্রথম ভাগের মধ্যে মাত্র একবার বছরে ধানচাষ হয়। পারিবারিকভাবে ধান চাষ করা হয়। মহিলারা বীজ বপন, আগাছা পরিষ্কার, শস্য ঝাড়ার কাজে অংশ নেয়। কিন্তু লাঙল ধরে না। গ্রামীন অর্থনৈতিক জীবনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বয়ন শিল্প। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবারে যুবতী মেয়েরা তাঁতে কাপড় বোনার কাজে অংশ নেয়।

খ্রিস্টপূর্ব ১৩৯৯ সাল থেকে মণিপুরী পঞ্জিকার প্রচলন রয়েছে। ওই পঞ্জিকায় এখন পালচা ৩৪০২ চলছে, আমরা ইংরেজিতে যাকে বলছি ২০০৪ সাল। মহারাজা মালিয়াফম পালচা-র জন্মতারিখ অনুযায়ী এই পঞ্জিকার উদ্ভব। একে বলা হয় 'মিতেই' পঞ্জিকা। মিতেই হরফে লোকসাহিত্যের সন্ধান মেলে প্রায় ছয় হাজার বছর আগেকার। মণিপুরী ভাষায় এই লোকসাহিত্যকে বলা হয় 'পুইয়া'।

মণিপুরের লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় মণিপুরী রাজপঞ্জি 'ঢেইথারোল কুম্বাবা' থেকে। এই ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে পুনর্লিখিত হয়েছে। ১৭০০ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচবার পুনর্লিখন করা হয়েছে রাজ আদেশে। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের নির্দেশে বামাচরণ মুখার্জি এই রাজপঞ্জি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এতে ৩৩ থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

---

৩৩ খ্রিস্টাব্দ পাখাঙ্গবা ১২০ বছর রাজত্ব করেন।

১৫৩-২৫৩ পুত্র খুয়ি তম্পকের রাজত্বকাল। কয়েকটি বড়ো ঢাক নির্মিত হয় এই সময়।

২৫৩-৩৩৩ পুত্র তাওথিঙমাঙ-এর রাজত্বকাল।

৩৩৩-৪০৮ পুত্র খুয়ি নিন্‌গন্‌বা-র রাজত্বকাল। এই সময় গৃহ নির্মাণ করে বাস করার প্রচলন হয়।

৪০৮-৪৫৮ পুত্র পেঙশিবা-র রাজত্বকাল।

৪৫৮-৪৮৬ পুত্র কাওখাঙ্গবা-র রাজত্বকাল।

৪৮৬-৫০৩ পুত্র নাওখাঙ্গবা-র রাজত্বকাল।

৫০৩-৫৩৩ পুত্র নওফাঙ্গবা-র রাজত্বকাল। এই পর্বে সিংহাসন-গৃহ 'কাঙলা' নির্মিত হয়।

৫৩৩-৬২৩ পুত্র নাওফাঙবা-র রাজত্বকাল।

৬২৩-৬৭৩ নাওফাঙবার পুত্র শামেইরাঙ সিংহাসনে বসে নিঙথাউ সোয়েফমবা-কে পরাস্ত করে তাঁর রাজ্য দখল করেন।

৬৭৩-৬৮৩ শামেইরাঙের পুত্র কোনথাউবা রাজা হয়ে নাগা প্রধানদের পরাস্ত করে শেলোই লাঙমাই গ্রাম দখল করেন।

৬৮৩-৭৫৩ নওথিঙ্গখোঙ্গবা-র রাজত্বকে মোঙাঙ্গ ও কমপঙ জয় করা হয়। এই সময় প্রচুর ঢাক ও ধাতব ঘণ্টা নির্মিত হয়।

৭৫৩-৭৬৩ পুত্র খঙতেকচা-র রাজত্বকালে মোইরাঙ-এর রাজা মণিপুরীদের আক্রমণ করেন। খঙতেকচা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে ৭৬৫ জনকে বন্দি করেন।

৭৬৩-৭৮০ পুত্র কাইরেম্বা-র রাজত্বকালে ধানের গোলা তৈরি হয়। মাটির ঘড়া, বাসন ব্যবহার শুরু হয়। কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রা উন্নত হতে শুরু করে।

৭৮০-৮০২ পুত্র ইয়ারাবা-রাজত্বকালে হওকিপ চিঙশাঙ-এর নাগা গ্রামগুলি দখল করা হয়।

৮০২-৮২১ পুত্র আয়াঙ্গবা-র রাজত্বকাল। রাজ্যদখল ও যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে।

৮২১-৮৪১ পুত্র নিঙথোউজিঙ রাজত্ব করেন।

৮৪১-৮৬০ চেঙ্গলাই ইপাল লান্‌থাবা-র রাজত্বকাল।

৮৬০-৯৪০ পুত্র ইয়াঙ্গলৌ কাইফাবা-র রাজত্বকাল।

৯৪০-১০৩০ ইরেঙবা-র রাজত্বকাল।

১০৩০-১১৪১ পুত্র লোয়ুম্বা-র রাজত্বকালে রাজবন্দনা সঙ্গীত অনগ্রিহাম্বা'র প্রচলন হয়।

১১৪১-১১৬৮ লোয়ুম্বার মৃত্যুকালে তাঁর পুত্রের বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। শিশু-রাজা লোইতঙবা-কে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর মা ও মন্ত্রীরা রাজ্য তথা যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

১১৬৮-১১৯৩ লোইতঙবা-র পুত্র হেমতৌ লোউনবা-র রাজত্বকাল।

১১৯৩-১২১৩ পুত্র থৌয়াল থাবা-র রাজত্বকাল।

১২১৩-১২২৫ পুত্র চিঙথা লান্‌থাবা-র রাজত্বকাল।

১২২৫-১২৫০ পুত্র পুরান্‌থাবা-র রাজত্বকাল।

১২৫০-১৩০৮ পুত্র খুমোন্‌বা-র রাজত্বকাল।

১৩০৮-১৩২৮ পুত্র মোইরাম্বা-র রাজত্বকাল।

১৩২৮-১৩৪০ থাঙ্গবি লান্‌থাবা-র রাজত্বকাল।

১৩৪০-১৩৫৭ পুত্র কোঙ্গিয়াম্বা-র রাজত্বকাল।

১৩৫৭-১৩৭২ পুত্র তেলহাইবা-র রাজত্বকাল।

১৩৭২-১৩৮১ পুত্র তাবুঙবা-র রাজত্বকাল।

১৩৮১-১৪২১ পুত্র পুনশিবা-র রাজত্বকাল।

১৪২১-১৪৪৫ পুত্র নিঙথৌখোম্বা-র রাজত্বকাল। তণ্ডুল প্রধান বিশালবাহিনী নিয়ে মণিপুর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলে পরাজিত হয়ে বন্দি হন।

১৪৪৫-১৫০৮ একমাত্র পুত্র কিয়াম্বা মাত্র ৬ বছর বয়সে রাজা হন। বর্মার রাজা পঙ নিঙথৌ-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কাবু প্রধানের অধীনস্থ কিয়াঙ গ্রাম দখল করেন। বর্মার রাজার সঙ্গে একত্রে নিঙথি নদীর (ছিন্দুইন নদী) ওপর ৬০০ ফুট লম্বা সেতু নির্মাণ করেন।

১৫০৮-১৫১২ কিয়াম্বা-র ১২ বছর বয়সী কনিষ্ঠ পুত্র কোইরেম্বা রাজত্ব করেন। তিনি পারিবারিক বিরোধে তাঁর কাকা বিদ্রোহী আঙ্গম নিঙথৌ-কে হত্যা করেন। এই সময় অহ্লুপ ও নাহারুপ লালুপ ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

১৫১২-১৫২৫ পুত্র লামকিয়াম্বা-র রাজত্বকাল।

১৫২৫-১৫৪৩ পুত্র নঙ্গৈইন ফাবা সিংহাসনে বসেন। তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর দশ বছর বয়সী পুত্র কাবোম্বা রাজা হন। কাবো উপত্যকার রাজা মণিপুর আক্রমণ করলে তাঁকে পরাস্ত করা হয়।

১৫৪৩-১৫৪৬ তাঙজাম্বা-র রাজত্বকাল।

১৫৪৬-১৫৬৩ ছালাম্বার রাজত্বকালে তণ্ডুল ও চিরু নাগা গ্রামগুলি দখল হয়। ১৫৫৩ সালে ভয়ানক ঝড়ে রাজবাড়ি সহ বহু বাড়ি ধূলিসাৎ হয়।

১৫৬৩-১৫৯৮ পুত্র মুঙ্গিয়ান্বা-র রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদের ভিতর 'সানা কেইথেল' নামে একটি বাজার স্থাপিত হয়।

১৫৯৮-১৬৫৩ পুত্র খাগেম্বা-র রাজত্বকালে সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়। বড়ো বড়ো বন্দুক তৈরি করা হয়। পালকি তৈরী শুরু হয়। উৎসবের সময় সম্মানিত পুরুষদের 'লুহুপ' নামক টুপি পরার প্রচলন হয়। চীনে খৈরাক্‌পা-কে পাঠান রাজা। চীনা পর্যটকরাও মণিপুরে আসেন। প্রাসাদের ভিতর নদী বুজিয়ে ফেলে তার পূর্বদিকে খাল কেটে নদীর ধারা পরিবর্তন করা হয়। নাম্বোল নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করা হয়। প্রথম ইটভাটা তৈরি হয়। ইট দিয়ে প্রাসাদে রাজার পাঁচতলা বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। বিশাল ধানের গুদাম তৈরি হয় লোকটাক হ্রদের থাঙ্গা দ্বীপে। দশটি বাজার স্থাপন করা হয়।

১৬১৫ সালে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গ্রামে মণিপুরী ভাষা ও মণিপুরী লেখা প্রবর্তন করা হয়। ১৬২৮-২৯ সালে রাজপ্রাসাদে উত্তরা গৃহ নির্মিত হয় এবং নুঙসাবা দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৩০ সালে সিংহাসন-গৃহ নির্মিত হয় এবং একটি ধর্মীয় উৎসব করা হয়। ১৬৩৪-৩৫ সালে খাগেম্বা ত্রিপুরা আক্রমণ করে ২০০ মানুষকে বন্দি করেন। এই সময় অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৬৪৮-৪৯ সালে বর্মীয় সেনারা মণিপুর আক্রমণ করে পরাস্ত হয়।

১৬৫৩-১৬৬৭ খাগেম্বা-র পুত্র খুনজাওবা-র রাজত্বকাল।

১৬৬৫-৬৬ সালে ইম্ফলের কেন্দ্রে খোয়ারিমবান্দে বিশাল প্রাকার সহ দুর্গ নির্মিত হয়।

১৬৬৭-১৬৯৮ পুত্র পাইখোম্বা-র আমলে প্রাসাদ এবং কাঙলা পুনর্নির্মিত হয়। এইসময় রাজা নানারকম অপরাধজনিত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

১৬৯৮-১৭১০ পুত্র চারাইরোঙ্গবা-র আমলে উত্তরা-গৃহ নির্মাণ করা হয়। রাজা পোলো খেলা এবং অন্যান্য আনোদ-প্রমোদের প্রবর্তন করেন। রাজ-পরিবারে নৌকা-প্রতিযোগিতার প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল।

১৭০৪-০৫ সালে আসাম থেকে ধর্মগুরু মৌনী গোঁসাই মণিপুরে এলে রাজা, তাঁর পরিবার, মন্ত্রী ও সর্দাররা তাঁর কাছে ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে গুরুর উপদেশ গ্রহণ করেন। পরের বছর আরও দুই ব্রাহ্মণ কামদেব এবং চন্দ্রশেখর মণিপুরে আসেন।

১৭১০-১৭৫১ পুত্র মৈনাবা অথবা গরিব নওয়াজ-এর রাজত্বকাল। কাঙলা পুনর্নির্মিত হয়।

১৭১৩-১৪ সালে বন্যা হয়। ১৭১৪-১৫ সালে দুর্ভিক্ষ হলে রাজা বাজারে গরিবদের ধান বিতরণ করেন। এইসময় বিচার ব্যবস্থার অঙ্গ হিশেবে চেইরাপ আদালত স্থাপন করা হয়। দেবি কালিকার মন্দির স্থাপন করা হয়। আসামের রাজগুরু শান্তিদাস মণিপুরে আসেন। রাজা গরিব নওয়াজ রামান্দি ধর্ম গ্রহণ করেন। মণিপুরীদের কাছ থেকে সমস্ত লোক সাহিত্য 'মিতেই পুইয়া' সংগ্রহ করে রাজার উপস্থিতিতে কাঙলার উত্তরা-গৃহে গুরু শান্তিদাসের উপদেশ মতো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রাজা তাঁর রাজ্যের প্রতি গৃহ প্রাঙ্গণে মৃতদেহ কবর না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। মিতেই দেবতা সানামাহি-র নতুন মন্দির স্থাপিত হয়। ১৭২৩-২৪ সালে রাজা প্রাচীন কয়েকটি দেবতার পূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন এবং ১১টি মন্দির ধ্বংস করেন। মিতেই পুরোহিত 'মাইবা'-র পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের পূজার জন্য নিযুক্ত করা হয়। রাজা বর্মার যুদ্ধে জয়ী হন। মণিপুরী প্রজাদের জন্য 'গোত্র'-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রাজাকে 'মহারাজ' উপাধি সহ অভিহিত করা শুরু হয়। কৃষ্ণ, কালিকা এবং হনুমানজীর পূজা প্রবর্তিত হয়। ১৭২৭-২৮ সালে শালোঙথেন-এ নতুন বাজার স্থাপিত হয়। ১৭৩৬-৩৭ সালে হিন্দুধর্মের সংস্কার করে নিত্যানন্দ রীতি অনুযায়ী বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করা হলে অধিকাংশ প্রজারাই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে নি। লবণের কূপ খনন করা হয়। ১৭৩৭ সালে রাজা তিন হাজার মণিপুরীকে নিয়ে অনুষ্ঠান সহকারে গুরুর উপস্থিতিতে পবিত্র সূত্র ধারণ করেন। ১৭৪০-৪১ সালে অহ্লুপ, নাহারুপ, খাম্বাম ও লাইকাম বিভাগের কর্মীরা গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে এসে কাঙলা এবং নতুন গুরুগৃহ নির্মাণ করে। ১৭৪২ থেকে ১৭৪৫ সালের মধ্যে তিনবার ভূমিকম্প হয়। ১৭৪৫ সালে পাখাঙ্গবা-গৃহ নির্মাণ করে সেখানে সিংহাসন স্থাপন করা হয়।

১৭৫১ সালো রাজা গরিব নওয়াজ তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে পুত্র জিঙশাই-কে শাসনভার দেন। ওইবছরই ডিসেম্বর মাসে জিঙসাই পিতাকে হত্যা করেন। পিতৃহত্যার জন্য প্রজারা বিদ্রোহ করে এবং জিঙসাই সিংহাসন-চ্যুত হন। ১৭৫৩ সালে ভারতশাই ক্ষমতায় আসেন। গরিব নওয়াজের আর এক পুত্র শামশাইয়ের পুত্র মোরাম্বা ১৭৫৪ সালে ভারতশাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে

মণিপুরের রাজসিংহাসন দখল করেন। ১৭৫৯ সালে মোরাম্বা নিজের ভাই চিত্তখাঙখোম্বা অথবা ভাগ্যচন্দ্রকে সিংহাসনে বসান। ১৭৬১ সালে ফের আর একবার মোরাম্বা সিংহাসনে বসেন।

…১৭৯৯ মোরাম্বার মৃত্যুর পর ভাগ্যচন্দ্র পুনরায় রাজা হন। ১৭৬২ সালেই যুবরাজ থাকাকালীন ভাগ্যচন্দ্র এক বৃটিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সেকপাও নামে নাগা গ্রাম আক্রমণ করেন। ১৭৬৪-৬৫ সালে বর্মা আক্রমণ করলে বর্মীয় সেনারা ভাগ্যচন্দ্রকে মণিপুর থেকে পশ্চাদপসরণ করে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বহু মণিপুরী প্রজাকে হত্যা করা হয়, বহু প্রজা পালিয়ে গিয়ে মৈরাঙ-এ আশ্রয় নেয়। ১৭৬৫ সালে দুল্লভশাই নিজেকে মণিপুরের মহারাজ ঘোষণা করেন। ১৭৬৭-৬৮ সালে ভাগ্যচন্দ্র ত্রিপুরা থেকে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে মণিপুরে আসেন। বর্মীয়রা তাঁকে আর একবার কাছারে পালিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। ১৭৭১ সালে বর্মীয়রা ভবানন্দকে সিংহাসনে বসায়। অবশেষে বহু যুদ্ধের পর ১৭৭২ সালে রাজা ভাগ্যচন্দ্র মণিপুরের রাজপ্রাসাদ উদ্ধার করেন। নতুন প্রাসাদ তৈরি করা হয় লাঙথাবাল-এ। ১৭৭৩ সালে ভাগ্যচন্দ্র বর্মা আক্রমণ করলে বর্মীয় সেনার প্রতি আক্রমণে ফের কাছাড়ে পালাতে বাধ্য হন। ১৭৭৫-৭৬ সালে তিনি লামাঙদঙ অথবা বিষ্ণুপুর প্রাসাদে এসে বসবাস করেন। ১৭৭৯-৮০ সালে তাঁর প্রাসাদ কাঞ্চিপুর লাঙথাবাল-এ স্থানান্তরিত হয়। ১৭৬২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতে বৃটিশ শাসন পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভাগ্যচন্দ্রের সঙ্গে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি চুক্তি হয়।

১৭৮২ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন সমস্ত প্রজারা বর্মীয় আক্রমণের সময়ে ফেলে দেওয়া পবিত্র সূত্র আবার 'প্রায়শ্চিত্ত' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন করে ধারণ করে। ১৭৮৩ সালে ভূমিকম্প হয়। রাজার উদ্যোগে এই বছরই গোবিন্দজী, সানামাহি সহ সকল দেবতার মূর্তি নতুন পুকুরে স্নান করিয়ে ছয়দিন ব্যাপী বিপুল ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। ১৭৮৯ সালে আসাম থেকে ষাটজন শিষ্য সহ এক ব্রাহ্মণ মণিপুরে এসে রাজাকে আট স্কন্দ শ্রীমদ্‌ভাগবত নামক পুরাণ-গ্রন্থ দান করেন। ১৭৯৪ সালে ফের ভূমিকম্প হয়। এই সময় রাজা তাঁর মন্ত্রী, সর্দার এবং রাজ্যের ভদ্র-সাধারণকে নিয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শোনেন। ১৭৯৫ সালে থাইখুল-এর নতুন প্রাসাদে বহু অট্টালিকা এবং গোবিন্দজী মন্দির নির্মিত হয়। ১৭৯৯ সালে বাঙলার নদীয়া জেলার নবদ্বীপে গঙ্গার তীরে এসে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

…১-১৮০১ পুত্র লাবেইনাচন্দ্রের রাজত্বকালে ঠাকুর অনন্ত বা অনাপতিকে গোবিন্দজী, রামজী ও মহাবলীর ভৃত্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

…১-১৮০৪ লাবেইনাচন্দ্রের ভাই মধুচন্দ্র সিংহাসনে বসেন। অপর দুই ভাইয়ের মধ্যে, চৌরজিৎ যুবরাজের পদে এবং মারজিৎ সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৮০৪-১৮১৩ যুবরাজ চৌরজিৎ কাছার থেকে এসে সিংহাসন দখল করেন। মধুচন্দ্র কাছাড়ে পালিয়ে যান। রাজা হয়ে চৌরজিৎ পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দকে তাঁর রাজত্বকালের ইতিহাস লিখবার নির্দেশ দেন। ১৮০৫ সালে মধুচন্দ্র বৃটিশ সরকারের সাহায্য নিয়ে মণিপুরের সিংহাসন উদ্ধার করতে আসেন। শানুপাল-এর যুদ্ধে চৌরজিৎ-এর সৈন্যদের হাতে মধুচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১০০জন বিপক্ষ সেনাকে হত্যা করা হয়, ৬০০ জন বন্দি হয়। খোয়াখুল-এর প্রাসাদ থেকে চৌরজিৎ পুরনো প্রাসাদে আসেন। বাঙলা থেকে 'নহবৎ' এনে বিশাল শোভাযাত্রা করে মহারাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেন। ১০৮ জন ব্রাহ্মণ-কন্যা মহারাজ ও মহারাণীর মাথায় জল ঢেলে দেয়। তাদের এক বাক্স করে লবণ উপহার দেওয়া হয়। ১৮০৬ সালে বসন্ত রাস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভুল সময়ে ঘণ্টা বাজানোর জন্য ঘড়িওয়ালাদের শাস্তি দেওয়া হয়। এই সময় ভূমিকম্প হয়। রাজার উদ্যোগে জোতিষীদের জন্য নতুন দপ্তর খোলা হয়। ইট দিয়ে নতুন গোবিন্দজীর মন্দির তৈরি করা হয়। চৌরজিৎ, মহারাণী সহ রাজ পরিবারের নারী-পুরুষ সদস্যরা এই নির্মাণকার্যে শ্রমদান করে। রাজা 'দেওয়ান' নামে একটি পদ সৃষ্টি করেন। মহারাজ ও যুবরাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ১৮১২ সালে যুবরাজ মারজিৎ দশ হাজার বর্মীয় সেনা নিয়ে মণিপুর আক্রমণ করেন। ১৮১৩ সালে কাকাচিঙ-এর এগার দিনের ভয়ানক যুদ্ধে চৌরজিৎ পরাজিত হয়ে কাছারে পালিয়ে যান। মারজিৎ সিংহাসনে বসেন।

১৮১৩-১৮২০ মারজিৎ-এর রাজত্বকাল। ১৮১৭-১৮ সালে কাছাড় রাজার প্রাসাদ দখল করে বহু মানুষকে বন্দি করা হয়। ১৮২০ সালে বর্মীয় সেনা মণিপুর রাজপ্রাসাদ দখল করে নাগা গ্রাম থেকে জয় সিং-কে এনে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাব দেয়। মারজিৎ কাছাড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন।

১৮২০-১৮৩৩ রাজপরিবারের অপর সদস্য হীরাচন্দ্র খোঙজাই নাগা গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বর্মীয়দের আক্রমণ করেন। কাকচিঙ-এর যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। ১৮২১ সালে বর্মীয়রা ফের আক্রমণ করে ত্রিশ হাজার মণিপুরীকে বন্দি করে। জয় সিং-কে বর্মীয়রা সিংহাসনে বসায়। দু'বছর তিনি রাজত্ব করেন। এরপর জয় সিং-কে বর্মায় নিয়ে গিয়ে যদু সিং-কে সিংহাসনে বসানো হয়। ১৮২৩ সালে তিনি মারা গেলে তাঁর পুত্র রাঘব সিং রাজত্ব করেন। বর্মীয় সেনাপতির সঙ্গে একযোগে রাঘব সিং কাছাড় আক্রমণ করেন। তিন হাজার বর্মীয় সেনা যুদ্ধে নিহত হয়।

ইতিমধ্যে গম্ভীর সিং কাছাড় থেকে মণিপুরের থাঙসেইবান-এ এসে রাজত্ব করতে শুরু করেন ১৮২১ সালে। এক বৃটিশ কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মণিপুর প্রাসাদ দখল করবার জন্য অগ্রসর হন ১৮২৫ সালে। ভীষণ যুদ্ধ হয়। বর্মীয়রা পালিয়ে যায় মণিপুর ছেড়ে। ১৮২৬ সালে বর্মীয় সরকারের দূষণ-মুক্ত করার জন্য মহারাজ গম্ভীর সিং সমস্ত প্রজাদের 'প্রায়শ্চিত্ত' অনুষ্ঠানে অংশ নেবার নির্দেশ দেন। বর্মার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে প্রথম ১৮২৩ সালে বৃটিশ ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানী মহারাজ গম্ভীর সিং-কে প্রত্যক্ষভাবে মদত করে। বর্মার সঙ্গে বৃটিশ শাসকদের ১৮২৬ সালের 'ইয়ান্দাবু চুক্তি'-তে মহারাজ গম্ভীর সিং-কে মণিপুরের শাসক হিশেবে মেনে নেওয়া হয়। এই চুক্তিতে মণিপুরের রাজ্য সীমানা এবং সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। কাঞ্চিপুরে লাঙথাবাল-এ গোবিন্দজী মন্দিরে বিপুল উৎসব করা হয়। বৃটিশ কর্মচারীদের জন্য বৃহৎ আবাস নির্মাণ করা হয়। ১৮২৮ সালে মারজিৎ কাছাড়ে মারা যান। চৌরজিৎ মারা যান নবদ্বীপে।

১৮৩২ সালে গম্ভীর সিং বারো চাকার জগন্নাথদেবের রথ তৈরি করিয়ে মণিপুরে রথযাত্রা উৎসবের প্রবর্তন করেন। উড়িষ্যা থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে রাজার আদেশে জগন্নাথ দেবের মূর্তি গড়েন।

১৮৩৩-১৮৪৪ ১৮৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার বৃটিশ বড়োসাহেব বর্মীয়দের চাষযোগ্য জমি না থাকায় কাবো উপত্যকার কিছু জমি বর্মার হাতে ছেড়ে দেবার জন্য মহারাজ গম্ভীর সিং-কে অনুরোধ করেন। বাৎসরিক ছয় হাজার টাকা অনুদানের বিনিময়ে মহারাজ এতে সম্মত হন। এই বছরই গম্ভীর সিংয়ের পুত্র মাত্র দুই বছরের শিশু চন্দ্রকীর্তি সিং-কে সিংহাসনে বসানো হয়। শিশু-রাজার হয়ে ওর কাকা নরসিং সেনাপতি রাজ্য শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৩৩ সালে বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে এক চুক্তি অনুযায়ী ১৮৩৫ সালে মণিপুরে বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের অফিস স্থাপিত হয়।

১৮৩৫-৩৬ সালে কাঞ্চিপুর লাঙথাবাল প্রাসাদে প্রথম 'কালীদমন' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪০-৪১ সালে কলেরায় ছয় হাজার মানুষ মারা যায়।

১৮৪৪ সালে রাজকুমার নবীন সিং যুবরাজ নরসিং-কে আক্রমণ করেন। যুবরাজ নরসিং তাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু মহারাজ চন্দ্রকীর্তি সিং তাঁর মাকে নিয়ে রাতের বেলায় কাছাড়ে পালিয়ে যান। সিংহাসনে বসেন নরসিং।

১৮৪৪-১৮৫০ মহারাজ নরসিং-এর রাজত্বকাল। ১৮৫০ সালে তিনি কলেরায় মারা যান। যুবরাজ দেবেন্দ্র সিং সিংহাসনে বসেন।

১৮৪৬ সালে মণিপুরের জঙ্গলে সাদা হাতি দেখা যায়। এই সময় মহারাজ নরসিং কর্তৃক কাঙলা উত্তরা অর্থাৎ প্রধান ফটকের সামনে দুটি সিংহ-স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়। ইম্ফল নদীর একটা সংক্ষিপ্ত ধারা মিনুথঙ থেকে সানজেনথঙ পর্যন্ত খনন করা হয়। এই সময় মণিপুরী চিকিৎসক 'মাইবা'-রা খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে মণিপুরী মাইবা আসামের রাজাকে জোরহাটে গিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলেন।

১৮৫০-১৮৮৬ মহারাজ চন্দ্রকীর্তি কাছাড় থেকে মণিপুরে রওনা হন। ওয়াইশেল নদীর তীরে মহারাজ দেবেন্দ্র সিংয়ের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। মহারাজ চন্দ্রকীর্তি লাঙথাবাল প্রাসাদ দখল করেন। মাত্র তিন মাসের রাজত্ব চালিয়ে দেবেন্দ্র সিং কাছাড়ে পালিয়ে যান।

১৮৫৮ সালে মণিপুরে বারুদ তৈরি শুরু হয়। বৃটিশ ভারত সরকারের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। নিম্ন বর্মা বৃটিশ ফৌজের দখলে চলে যায়। এই বছর জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় বরুণদেবের তুষ্টির জন্য রাজা নগর সংকীর্তণে নেতৃত্ব দেন। ধান চাষ অবশ্য মার খায়। এর আগে ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য চন্দ্রকীর্তি সিং সৈন্য দিয়ে বৃটিশ বাহিনীকে সাহায্য করেন।

১৮৬৪ সাল থেকে বৃটিশ কর্মচারী এবং মণিপুরে নিযুক্ত বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে চন্দ্রকীর্তি সিং-এর সম্পর্কের সাময়িক অবনতি ঘটে। ১৮৭৭ সালে ছয় মাস বৃষ্টি না হওয়ায় খোয়ারিমবান্দ বাজারে মহিলারা বৃষ্টি প্রার্থনা করে ক্রন্দন করেন। কাঙলাতেও সাতদিন ধরে পূজা ও প্রার্থনা করা হয়। মহারাজ চন্দ্রকীর্তি এইসময় জুয়াখেলা এবং দেশীয় মদ উৎপাদন নিষিদ্ধ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের আগে 'শ্রী' লেখার জন্য রাজা কঠোরভাবে আদেশ দেন।

১৮৮৬-১৮৯০ ১৮৮৬ সালে মহারাজ চন্দ্রকীর্তি সিং-এর মৃত্যু হলে যুবরাজ সুরচন্দ্র সিং সিংহাসনে বসেন। অপর রাজকুমার বোরা ছাওবা নতুন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়, বোরা ছাওবা কাছাড়ে পালিয়ে যান।

১৮৯০ সালে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। তার তিনদিন পর রাত্রি দুটোর সময় কয়েকজন রাজকুমার এবং সেনাপতি বিদ্রোহ করে রাজাকে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করেন। রাজা সুরচন্দ্র বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের বাংলোয় আশ্রয় নেন এবং পরে বৃন্দাবনে চলে যান। সাতাশ বছর বয়সী যুবরাজ কুলচন্দ্র সিং-কে ফয়জিঙ থেকে এনে সিংহাসনে বসানো হয়।

১৮৯০-১৮৯১ ১৮২৩ সালের ইয়ান্দমাবু চুক্তির সময় থেকে অর্থাৎ গম্ভীর সিং-এর রাজত্বকাল থেকে বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে রাজপরিবারের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট এবং অন্যান্য সাহেবদের সঙ্গে মহারাজাদের 'দরবার' অর্থাৎ শলা-পরামর্শ চলতে থাকে।

১৮৯১ সালে চিফ কমিশনারকে মহারাজ কুলচন্দ্র সিং মণিপুরে স্বাগত জানান। তিনি চারশত সিপাই নিয়ে তাঁর রেসিডেন্সিতে আসেন। এইসময় রাজাকে তিনি অপমান করেন। তাঁর অনুরোধে তাঁরই রেসিডেন্সিতে রাত্রে রাসলীলা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কুলচন্দ্র। ওই রাতেই চিফ কমিশনারের সেপাইরা যুবরাজের দুর্গে প্রবেশ করে গুলি চালাতে শুরু করে। প্রাসাদের পূর্বদিকের কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন মারা যায়। রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। অবশেষে চিফ কমিশনার দরবার ডেকে নিজের অপরাধ প্রকাশ করতে চান। যুবরাজ সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত সিং (মহারাজ চন্দ্রকীর্তির তৃতীয় পুত্র) এবং কাঙ্গাবা থাঙাল মেজর চিফ কমিশনারকে অস্ত্র সমর্পন করতে বললে তিনি তাতে রাজি হলেন না। সেনাপতি ও মেজরের আদেশে চিফ কমিশনার এবং বিউগ্‌লার-এর ফাঁসি হল কাঙলার মূল ফটক 'উত্তরা'-র সামনে। পণ্ডিতদের

ডেকে ওঁদের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হল। ওঁদের মুণ্ড দুটি উত্তরার সামনের ঘেরা জায়গায় সমাধিস্থ করা হল। দেহ দুটি সমাধিস্থ হলো খোয়ারিমবান্দ বাজারে। জনসাধারণ এরপর রেসিডেন্সি বাংলোয় আগুন ধরিয়ে দিলে সাহেব, মেমসাহেব এবং বাকি কর্মচারী ও সেপাইরা পালিয়ে যায়।

১৮৯১ সালের ২২ মার্চ আসামের চিফ কমিশনার জে. ডব্লু কুইন্টন চারশত গোর্খা সেপাই নিয়ে মণিপুর আক্রমণ করেন। বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে আথকপাম গ্রামের আরঙ ব্রীজে যুদ্ধ শুরু হয়। মণিপুরীরা যুদ্ধে পিছু হটতে থাকে। সিপাইরা গোবিন্দজী মন্দিরের সম্পদ বাদ দিয়ে গ্রামগুলিতে লুঠতরাজ শুরু করে। মহারাজ কুলচন্দ্র সিং-কে গ্রেপ্তার করা হয়। যুবরাজ সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিং, থাঙাল মেজর এবং সুবেদার নিরঞ্জন সিংকে কাঙলার রাজকীয় পোলো ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ফাঁসি দেওয়া হয়।

অ্যাসিস্টান্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট কাঙলায় বসে শাসন পরিচালনা করেন। মণিপুর রাজপঞ্জি বাঙলা হরফে লেখা শুরু হয়। গোবিন্দজীর পূজা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাবু বামাচরণ মুখার্জিকে রাজপঞ্জির ইংরেজি অনুবাদ করতে দেওয়া হয়। মহারাজ গরিব নওয়াজ-এর আমল থেকে রাজবংশলতিকা তৈরি করানো হয় পাঁচদিনের মধ্যে। মহারাজ গম্ভীর সিং-এর বংশধরদের অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাঁর জ্ঞাতিভাই নরসিং মহারাজের পৌত্র আট বছর বয়সী চূড়াচাঁদকে রাজা হিশেবে মনোনীত করা হয়।

১৮৯১-১৯০৭ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১, মণিপুর একটি সামন্ততান্ত্রিক ধারার রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়, মহারাজ চূড়াচাঁদ অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দরুণ একজন বৃটিশ অফিসারকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৯২ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর ম্যাক্সুয়াল আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়াচাঁদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেন। চূড়াচাঁদকে প্রথমে আজমীরের মেয়ো কলেজে এবং পরে দেরাদুনের এম্পিরিয়াল ক্যাডেট কর্পস-এ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

১৮৯২ সালে মণিপুরের গ্রামীণ কৌমগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা 'লালুপ' ভেঙ্গে দেয় বৃটিশ শাসকেরা। এতে গ্রামপ্রধানকে কেন্দ্র করে ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়সী পুরুষেরা প্রতিমাসে দশদিন সরকারি প্রশাসনিক কাজে অংশ নিত এবং তার বিনিময়ে এক 'পারি' (তিন একর) জমি চাষের জন্য পেত। বৃটিশ শাসকেরা গৃহকর এবং জমি-কর প্রবর্তন করল। ১৮৯৮ সালে গ্রামগত চৌকিদারী ব্যবস্থা ভেঙ্গে একশ পরিবার প্রতি একজন চৌকিদার এবং কয়েকজন পুলিশ নিয়োগ করা হল। ১৮৯৯-১৯০০ সাল নাগাদ গৃহকর বিলোপ করা হল।

১৯০৭ সালের ১৫ মে চূড়াচাঁদ বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের হাত থেকে শাসনভার গ্রহণ করলেন। তাঁকে শাসন কাজে সাহায্য করার জন্য একটা দরবার প্রতিষ্ঠা করা হলো। এই দরবারে একজন আইসিএস অফিসারকে সভাপতি করে ৬ জন মণিপুরীকে সদস্য হিসেবে রাখা হল।

১৯০২ প্রথম সেকেন্ডারী স্কুল এবং শিক্ষা শুরু হয়।

১৯০৪ বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টের বাসভবন কিছু সরকার-বিরোধী মানুষ পুড়িয়ে দেয়। পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর ম্যাক্রয়াল ওই বাসভবন পুনর্নির্মাণের কাজে মণিপুরীদের বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের নির্দেশ দেন। হাজার হাজার মহিলা সমবেত হয়ে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। বৃটিশ ফৌজ দিয়ে মহিলাদের দমন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু ওই নির্দেশ ম্যাক্সুয়েলকে প্রত্যাহার করতে হয়। একে বলা হয় প্রথম 'নুপি লা' অর্থাৎ মেয়েদের যুদ্ধ।

১৯২৫ সরকারের জলকর বসানোর প্রতিবাদ করেন মহিলারা। এটি দ্বিতীয় নুপি লা।

১৯৩০-৪০ ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি মণিপুরে ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার স্ফূরণ দেখা দেয়। মহারাজা এবং দরবারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। অবশ্য মণিপুরী জাতীয়তাবাদের প্রথম সাংগঠনিক রূপ দেখা যায় রাজপ্রাসাদেই, 'নিখিল হিন্দু মণিপুরী মহাসভা' গঠনের মধ্য দিয়ে। এর সভাপতিত্ব করেন মহারাজ চূড়াচাঁদ। দ্বিতীয় বছর এই মহাসভার অধিবেশন হয় বর্মাতে, তৃতীয় অধিবেশন হয় বরাক উপত্যকায়। চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন হয় ইম্ফলে। ১৯ নভেম্বর ১৯৩৩ হিজম ইরাবত সিং এই মহাসভায় নেতৃত্ব দেন। সেখানে মণিপুরের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য 'হিন্দু' শব্দটি এর নাম থেকে বাদ দেওয়া হয়। মহারাজের সঙ্গে নিখিল মণিপুর মহাসভার নেতৃত্বের নীতিগত বিরোধ বাড়তে থাকে।

১৯৩৯ সালে মণিপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আগস্ট মাসে খোয়ারিমবান্দ বাজারের মহিলা বিক্রেতারা বাজার বয়কট করে। রাজদরবার চলাকালীন তারা সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। দরবারের সদস্যরা পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেও দরবার সভাপতি শার্পকে আটকে ঘেরাও করে মহিলারা তাঁকে টেলিগ্রাফ অফিসে নিয়ে যায়। মণিপুরের চাল অন্যত্র রপ্তানী করার আদেশ রদ না করা পর্যন্ত শার্প এবং চতুর্থ আসাম রাইফেল্‌স কমান্ডান্টকে ঘেরাও করে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মহিলারা। সেই তুমুল বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে টেলিগ্রাফ অফিসে বিউগ্‌ল বাজিয়ে সেনা নামিয়ে দেওয়া হয়। মাঝরাতে শার্প ও অন্যান্য অফিসাররা ছাড়া পান। ২১ জন মহিলা আহত হয়। বহু মহিলা চাল বোঝাই লরির সামনে রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী পরিচালিত মণিপুরের সবচেয়ে বড়ো চালকলের সামনে মাঝরাতে দশ হাজার মহিলা মিছিল করে জড়ো হয়। দেড়বছর ব্যাপী এই আন্দোলনের ফলে চাল রপ্তানীর সরকারি আদেশ রদ করা হয়। খোয়ারিমবান্দ বাজারের বয়কটও চলেছিল ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। এই আন্দোলন তৃতীয় 'নুপি লা' নামে খ্যাত।

১৯৪০-১৯৪৬	২৮ জানুয়ারি হিজম ইরাবত সিং কৃষকদের নিয়ে 'মণিপুর প্রজা সম্মিলন' গঠন করেন। কৃষকেরা কর বর্জন আন্দোলনে শামিল হয়। ২৪-২৫ আগস্ট ছয় সংগঠন মণিপুর প্রজা সম্মিলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আসাম কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধী ও নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। ১৯৪০ সালেই প্রজাবিদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্য ইরাবতের বিচার হয় এবং তাঁকে সিলেট জেলে বন্দি করে রাখা হয়। ১৯৪৩ সালে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি আত্মগোপন করেন এবং সেইবছরের শেষের দিকে ফের গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে ছাড়া পেলে তাঁকে শিলচরে বসবাস করার অনুমতি দেয় বৃটিশ সরকার। সেখানে তিনি 'আসাম কৃষক সভা' সংগঠিত করেন এবং সর্বভারতীয় কিসান সভার নবম অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে শিলচর কেন্দ্র থেকে আসাম প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন। মণিপুরে ফিরে এসে তিনি 'মণিপুর প্রজা সম্মিলন'-কে পুনর্গঠিত করে করে তোলেন। 'মণিপুর প্রজা মন্ডল'-এর সঙ্গে মিলে 'মণিপুর প্রজা সঙ্ঘ' তৈরি হয়। এরপর ইরাবত সিং বর্মার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে বর্মায় যান এবং সেখানেই মারা যান।
১৯৪১	সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বৃটিশ অভিভাবকত্বে রাজ্য পরিচালনায় ক্ষুব্ধ হয়ে চূড়াচাঁদ সিংহাসন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নবদ্বীপে তীর্থযাত্রা করতে যান। নভেম্বর মাসে যক্ষ্মারোগে সেখানেই মারা যান।
১৯৪৭	বৃটিশ পলিটিকাল এজেন্ট মারফত শাসনব্যবস্থার বিলোপ
১৫ই আগস্ট	হয় এবং মণিপুর স্বাধীনতা লাভ করে। মহারাজ বোধচন্দ্রের হাতে সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতা অর্পিত হয়। মার্চ মাসে পর্বত ও উপত্যকার চোদ্দজন সদস্য নিয়ে সংবিধান খসড়া-প্রস্তুত কমিটি তৈরি হয়েছিল। মহারাজকে শাসন পরিচালনায় সাতজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত কাউন্সিল সহযোগিতা করে।
২৬ আগস্ট	মণিপুর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি রচিত সংবিধান গৃহীত হয়। মণিপুরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হয়।
১৯৪৮	জুন মাসে উপত্যকায় এবং জুলাই মাসে পার্বত্য অঞ্চলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিধানসভা গঠিত হয়। মহারাজা ১৮ অক্টোবর ৫৩ সদস্যের বিধানসভার সূচনা করেন।
১৯৪৯	মহারাজা বোধচন্দ্রকে শিলঙে নিয়ে বন্দি করে 'অন্তর্ভুক্তিকরণ
২১ সেপ্টেম্বর	চুক্তি'-তে স্বাক্ষর নিয়ে ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
১৫ অক্টোবর	ভারতীয় সংবিধানের 'গ' বিভাগ অনুযায়ী ভারত সরকার একজন চিফ কমিশনার নিয়োগ করে মণিপুরের প্রশাসন পরিচালনা করে।
১৯৫০-১৯৫১	একটি পরামর্শজ্ঞাপক সরকার প্রবর্তিত হয়। মণিপুরে হিজম ইরাবত সিং-এর অনুগামীদের মধ্য থেকে বিপ্লবী ধারার সংগঠন 'মিতেই স্টেট কমিটি' গঠিত হয়।
১৯৫৭	ভারত সরকার মণিপুরে ৩০জন নির্বাচিত এবং ২জন মনোনীত সদস্য নিয়ে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করে।
১৯৫৮	আর্মড ফোর্সেস (আসাম অ্যান্ড মণিপুর) স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়।
১৯৬৩	নতুন প্রণীত 'ইউনিয়ন টেরিটরিজ অ্যাক্ট, ১৯৬৩' অনুযায়ী ভারত সরকার ৩০জন নির্বাচিত এবং ৩ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে বিধানসভা গঠন করে।
১৯৬৪	বিপ্লবী জঙ্গি ধারার সংগঠন 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' তৈরি হয়। শহিদ টিকেন্দ্রজিৎ সিং-এর পৌত্র মেঘেন এর নেতৃত্ব দেন। তিনি কলকাতায় এসে শিক্ষালাভ করেন এবং বামপন্থী রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন।
১৯৬৯	মণিপুর বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি
১৬ অক্টোবর	করা হয়। এই সময় ইরাবতের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় 'ইয়ুথ লিগ' গঠন করে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস ফ্রম মণিপুর' গঠিত হয়।
১৯ ডিসেম্বর	মণিপুরের চিফ কমিশনার পদ বিলোপ করে লেফটেনান্ট গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।
১৯৭২	মণিপুর রাজ্যপালের অধীনে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়।
২১ জানুয়ারি	
৫ এপ্রিল	'আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার্স) রেগুলেশন, ১৯৫৮' খারিজ করে 'আর্মড ফোর্সেস (আসাম অ্যান্ড মণিপুর) স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট, ১৯৫৮'-এর পরিধি সংশোধিত হয়ে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা ছাড়াও নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
১৯৭৭-১৯৭৮	জঙ্গি ধারার সংগঠন 'পিপল্‌স রেভোলিউশনারি পার্টি অব কাঙলাইপাক' এবং 'পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি গড়ে ওঠে।
১৯৮০	সমগ্র মণিপুরকে উপদ্রুত, এলাকা ঘোষণা করার মাধ্যমে
২৮ সেপ্টেম্বর	মণিপুরে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট, ১৯৫৮ বলবৎ হয়।

সূত্র :

১. **The Lost Kingdom by L. Joychandra Singh.**

২. **Ceasefire or Setting the North East on Fire : Peace in Jeopardy by People's Solidarity for Peace and Democracy Imphal, Manipur (India).**

২. **The Statesman's Year Book, 2001 edited by Barry Turner.**

উন্নয়নের সূত্র ধরে ... ২ পৃষ্ঠার শেষাংশ

প্রয়োজন; নাহলে সেই জানা কেবলমাত্র empirical রয়ে যাবে এবং তা এক অসম্পূর্ণ জানা হবে। কোন শ্রমিক নেতার দরদী হওয়া, আবার অন্য শ্রমিক নেতার ঔদাসীন্য দুটো বিরোধী ব্যাপার হবে না। অদৃশ্য পুঁজির শক্তিশালী, সুদূরপ্রসারী হাতের অস্তিত্ব লক্ষিত হবে না। এ বিষয়ে অধিস্তরে (meta-level) প্রশ্ন উত্থাপন করলে মনে হতে পারে বুঝি পুঁজির স্তুতি করা হচ্ছে, চিন্তায় এইরকম ভুলভ্রান্তি ঘটে যায়। কোন ঘটনাকে বা বিষয়কে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, বুঝতে গেলে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে চলবে না, ওপর থেকে দেখতে হবে। তবেই পুরো ছবিটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এইখানেই অধিস্তরের চিন্তাভাবনা, আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আর সৌরীনবাবু সেইটাই করতে চেয়েছেন।

যেহেতু দীপেনবাবুর সঙ্গে প্রথমার্ধের আলোচনায় সৌরীনবাবু বারবার ব্যাহত হয়েছেন, তাঁর মতামত প্রকাশে পরবর্তী অংশটি দ্রুত শেষ করতে হয়েছে সময়াভাবে। এই অংশটি নিয়ে আলোচনা চলুক, আমি আগ্রহী।

২ অক্টোবর ২০০৪

সীমা ষড়ঙ্গী

সন্তোষপুর, কলকাতা

উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মণিপুরের সমস্যা

...বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সমীর কুমার দাসের সঙ্গে ১১ অক্টোবর ২০০৪ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। আলোচ্য বিষয়টি বহু জটিলতা নিয়েই ... রয়েছে। আরও বিস্তৃত আলোচনা এ-নিয়ে জরুরি। সমীর কুমার দাস এ-নিয়ে পাঠকদের কাছ থেকে সমালোচনা, প্রশ্ন ও তর্ক দাবি করছেন। আশা করি, পাঠকরা ...টি কার্যকর সংলাপের অঙ্গ হিশেবে এই সাক্ষাৎকারকে গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পটভূমিতে মণিপুরের সমস্যা ...নিয়ে আপনার কাছে শুনতে চাই।

সমীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমস্যাটির মাত্রা, আয়তন, প্রকৃতি সবগুলোই খুব বড়ো। তবু ছোটো করে বলতে গেলে, আমি যেভাবে সমস্যাটাকে বুঝতে চেয়েছি এতদিন, এককথায়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক এবং সত্তাগত অধিকার, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি রাইট টু আইডেন্টিটি, সেই দাবিগুলোর রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাওয়ার সমস্যা। কিন্তু এইটুকু বললেই তো আর হল না। এর অসংখ্য জটিলতা রয়েছে, তার দু-একটার দিকে নজর না ফেরালে আমাদের আলোচনাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এক নম্বর জটিলতা হচ্ছে, যাঁরা এই সাংস্কৃতিক ও সত্তাগত অধিকারের দাবিগুলো তুলছেন, তাঁরা কি সত্যিই সেই বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষজনের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করছেন? প্রতিনিধিত্ব বা রিপ্রেজেন্টেশনের প্রশ্নটা আজ খুবই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি প্রতিনিধি হিশেবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র জঙ্গী সংগঠনগুলোর কথাই বলছি না, অনেকক্ষেত্রে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর কথাও এসে পড়ছে। আমি একটু উত্তর-পূর্ব ভারতের বাইরে গিয়ে একটা উদাহরণ দিই। অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্সের বিরুদ্ধে কাশ্মীরে ভারত সরকারের একটা বড়ো আপত্তির কারণ এটাই, তাঁদের সঙ্গে কথা বা আলাপ-আলোচনা চালানো যাবে না, কারণ তাঁরা সব কাশ্মীরিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছেন কিনা সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। ফলে এই প্রতিনিধিত্বের জায়গাটা আজকে একটা জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিত্বের কোনও স্বচ্ছ বা পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা তাঁরাও গড়ে তুলতে যেমন পারেননি, এটাও সত্যি যে তাঁদের গড়ে তুলতে দেওয়াও হয়নি। আমি এপ্রসঙ্গে পরে পুরসমাজ বা সিভিল সোসাইটির আলোচনায় আসব, কারণ পুরসমাজ এমন এক চৌহদ্দি যার মধ্যেই আমরা অধিকারের ভাষায় কথাগুলো বলি, অধিকারের দাবিগুলো তুলি। এবং অন্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমার অধিকারের মাত্রা, আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গম করি। এপ্রসঙ্গে আমার মনে হয়েছে ১৯৯০ সালটা, অসমে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী বা যাকে আমরা 'আলফা' বলি, তার জীবনকালে একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর। কেননা তার আগের আলফার চরিত্রের সঙ্গে পরের আলফার চরিত্রের একটা বিশাল পার্থক্য ঘটে গেছে। ১৯৯০-এর আগে এই আলফার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ ছিল। একজন পুলিশ অফিসার— তিনি আলফার সমর্থক ছিলেন এমন ভাবার কোনও কারণ নেই— বলেছিলেন, আলফার ছেলেরা হচ্ছে আনইউনিফর্মড পুলিশমেন, আর পুলিশ হচ্ছে ইউনিফর্মড আলফা। এদের ব্যবধানটা বোঝাতে গিয়ে এই উপমাটা আমার খুব মনে ধরেছিল। ১৯৯০-এর পরে কিন্তু চেহারাটা পাল্টে যেতে থাকে। একের পর এক সেনা অভিযান শুরু হয়। অপারেশন বজরং দিয়ে শুরু হয়, তারপর অপারেশন রাইনো, এখন অপারেশন রাইনো(২)-এর মধ্যে আছি আমরা। যত বেশি করে সেনা অভিযান চলতে থাকে, তত বেশি আলফা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়। জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ১৯৯০-এর পরবর্তীকালে তার যা পরিণাম হতে পারে, আমরা তা-ই হতে দেখছি।

তৃতীয় জটিলতা যা লক্ষ করা যাচ্ছে, তা হল, এই সাংস্কৃতিক ও সত্তাগত অধিকারের দাবিগুলোর মধ্যে একধরনের পরস্পর-বিরোধিতা। আমাদের হাতে এমন কোনও মানদণ্ড নেই যা দিয়ে আমরা বলতে পারি, 'ক' জনগোষ্ঠীর দাবি বেশি বৈধ এবং 'খ' জনগোষ্ঠীর দাবি সম্পূর্ণ অবৈধ। আমি একটা উদাহরণ দিই। পার্বত্য মণিপুরের অন্তত তিনটি জেলার ওপর নাগা জঙ্গি সংগঠন 'নাগা সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (আই-এম)' তাদের দাবি পেশ করেছে। তারা মনে করছে, ওই তিনটি জেলা অখণ্ড 'বৃহত্তর নাগালিম'-এর অংশ। উল্টোদিকে মেইতেইদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করুন। অনেকগুলো সংগঠন মেইতেইদের তরফে তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে, যেমন আমকো অর্থাৎ অল মণিপুর ক্লাবস্ অর্গানাইজেশন, ইউনাইটেড কমিটি মণিপুর, বা আজকের আপনুবা লুপ। এই ধরনের সংগঠনগুলো বলছে, পার্বত্য মণিপুর এবং মণিপুর উপত্যকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। একে অপরের অপরিহার্য অঙ্গ। ফলে মণিপুরের অখণ্ডতার প্রশ্নে এরা সকলে এককাট্টা। আমার হাতে এমন কোনও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই যা দিয়ে আমি বুঝে নিতে পারব কার দাবিটা বৈধ, কারটা অবৈধ।

শেষ যে জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা হল, সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবির স্বীকৃতি কি রাষ্ট্রের পক্ষে দেওয়া সম্ভব বা রাষ্ট্র দিতে পারে? আমি এপ্রসঙ্গে দুটো জঙ্গি সংগঠনের কথা বলছি বা তাদের মধ্যে পার্থক্য টানার চেষ্টা করছি বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য। একদিকে আলফা, যারা তুড়ি মেরে যাবতীয় আলাপ-আলোচনা উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ভারত সরকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করেন, তাহলে তারা ভারত সরকারের সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনায় বসবে না। রাষ্ট্রের পক্ষে এই ধরনের অধিকারকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়তো বর্তমানে অসম্ভব। উল্টোদিকে, একই প্রশ্নে এনএসসিএন(আই-

এম)-এর বক্তব্য হল, তোমরা তোমাদের সংবিধান সংশোধন করবে না কী করবে, সেটা তোমাদের মাথাব্যথা। আমরা তোমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব। আমরা আমাদের দাবিদাওয়া তোমাদের কাছে পেশ করব। বাকি তোমরা কীভাবে সেটা সম্ভব করবে, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আলফার বক্তব্যটা আমার মনে হয়েছে আইনী, এনএসসিএন(আই-এম)-এর বক্তব্যের মধ্যে একধরনের খোলামেলা ভাব রয়েছে। মোটামুটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যা হিশেবে এগুলোই আমি লক্ষ্য করেছি।

ম. স. স্টেটসম্যান পত্রিকায় ২ অক্টোবর বি.কে. রায়বর্মণের একটা লেখাতে পাচ্ছি, মণিপুরে ১৯৯৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর 'সোসাল পলিসি অ্যাডভাইসরি কমিটি' পর্বত ও উপত্যকার নানান স্বার্থ ও জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিল—

স. দা. এরকম আরও অনেক সুপারিশ হয়েছে, এই বিশেষ সুপারিশটা সম্পর্কেও আমি ওয়াকিবহাল। আরও হবে ভবিষ্যতে। আমার কাছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্যাটা কেবল উন্নয়নের নয়। সমস্যাটাকে উন্নয়নের একটা খাপে ভরে ছোটো করে ফেলার একটা প্রবণতা রয়েছে, যার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি। ইতিহাস, সংস্কৃতি এখানে গৌণ বিষয়। এদের প্রত্যাশাটা হল এই, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ যদি উপত্যকার সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেন উন্নয়নের মাধ্যমে। যেমন, মাথাপিছু জাতীয় আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, রাস্তাঘাট-যোগাযোগ ব্যবস্থা— এইসব উন্নয়নের সাবেকি সূচকগুলো ধরে তাঁরা যদি অন্যান্য মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেন, তাহলে তাঁরা আর সাংস্কৃতিক ও সত্তাগত অধিকারের দাবিগুলো নিয়ে মাথামাতি করবেন না। এই হচ্ছে ভারত সরকারের প্রত্যাশা, অদ্যাবধি এই প্রচেষ্টাই তাঁরা নিয়েছেন। উল্টোটা অনেক ক্ষেত্রে সত্যি হয়। যেমন, উন্নত জায়গাতেও সাংস্কৃতিক ও সত্তাগত অধিকারের আন্দোলন আমরা দেখেছি, যেমন, খালিস্তান। আবার অত্যন্ত অনুন্নত জায়গা, যেমন, অরুণাচল প্রদেশে আমরা ওই আন্দোলন তাদৃশ লক্ষ্য করি না। উন্নয়নের খাপে ভরে সমস্যাটাকে দেখা আসলে আমাদের চোখে একটা ঠুলি পড়িয়ে দিচ্ছে।

মার্কসবাদীরাও অনেকে অর্থনীতি এবং উন্নয়নের গোঁড়ামীর মধ্যে বিষয়টাকে দেখছেন। সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য তাঁরাও দায়ী।

ম. স. মণিপুরের সমস্যাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভাগ-ভাগ করে বললে সুবিধা হয়।

স. দা. সবটা তো জট পাকিয়ে রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করছি আলাদা করে বলার। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটাকে আমি একত্র করেছি।

মণিপুরকে বুঝতে গেলে কিন্তু মণিপুরের ভূগোলটাকে বুঝতে হবে। তার কারণ মণিপুরের ৭০ শতাংশ পার্বত্য অঞ্চল, ৩০ শতাংশ উপত্যকা। উল্টোদিকে জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখুন, ৭০ শতাংশ মানুষ বাস করে উপত্যকায়, ৩০ শতাংশ পার্বত্য অঞ্চলে। পার্বত্য অঞ্চলে স্বতন্ত্র গৃহভূমির দাবি আমরা লক্ষ্য করেছি নাগা ও কুকিদের মধ্যে। বিরোধিতার কথা এলেই মনে হয় একদিকে নাগা ও অপরদিকে কুকি এরকম যুধ্যমান দুটো জনগোষ্ঠী যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে কিন্তু এরকম জনগোষ্ঠী দাঁড়িয়ে নেই। তার কারণ হচ্ছে এই, দুই জনগোষ্ঠীর মাঝখানে এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে, যাদের অবস্থাটা হচ্ছে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়' গোছের। এরা প্রকৃতপক্ষে নাগা-কুকি বিভাগের মধ্যে পড়ছে না, কিন্তু নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পড়তে বাধ্য হচ্ছে। যেমন, অনল, চিরু নামে কতগুলো ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠী আছে, যাঁরা এতকাল নিজেদের কুকি বলে পরিচয় দিতেন। এখন তাঁরা নাগা হয়েছেন।

ম. স. কেন? কোনও রাজনৈতিক কারণে?

স. দা. কেন বলতে গেলে একটা ইতিহাস বলতে হয়। রাজনৈতিক কারণেই হয়েছে। এখানে একটা তাত্ত্বিক বিষয় বলে নিই। আইডেনটিটি বা পরিচয় কারো মধ্যে স্ট্যাম্প মারা থাকে না, সেটা রাজনৈতিকভাবে স্থির হয়। পরিচয় আবহমান কাল থেকে চলতে থাকে না। রাজনৈতিক অভিঘাতে তৈরি হয়। আত্মপরিচয় যেভাবে রাজনৈতিকভাবে তৈরি হয়, মানুষ সেভাবেই আত্মপরিচয় দেয়, কোনও প্রদত্ত ও অমোঘ আত্মপরিচয় নেই।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা জঙ্গি নাগা আন্দোলনের শীর্ষে ছিলেন, সেই সংগঠনটির নাম নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল। শুনলে আপনারা আশ্চর্য হবেন, এর মধ্যে কুকি সদস্য ছিলেন। তাহলে আজকে নাগা-কুকি বিরোধের এমন এক হিংসাত্মক চেহারা আমরা দেখি কী করে? এর মধ্যে অনেক সময় গেছে, নাগা-কুকি বিরোধ একটা বিশেষ চেহারা নিয়েছে। এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে অনল, চিরু, বা আরও অনেক উপজাতির কথা বলা যায়। যাঁরা সংখ্যায় হয়তো কয়েক হাজার, একটা কর্তার লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতকাল, এখন একটা অবস্থান তাঁদের বেছে নিতে হচ্ছে। তাঁদের কাছে এটা প্রায় বাধ্যতামূলক, তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এবং একটা অখণ্ড নাগা জনগোষ্ঠী গঠনের প্রক্রিয়া কিন্তু সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ধরেই চলছে। গত দেড়শ বছরের হিশেব যদি আপনারা নেন, দেখবেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাগা জনগোষ্ঠী একটা অখণ্ড বৃহত্তর নাগা সত্তার মধ্যে বিলীন হচ্ছেন বা বিলীন হবার পথে। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা পার্বত্য মণিপুরের নাগাদের নিয়ে যতটা কথা বলেছেন, অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ চাংলাং জেলার নাগাদের নিয়ে ততটা কথা বলতেন না। কিন্তু গত দু-তিন বছরে লক্ষ্য করছি, অরুণাচলের নাগাদের নিয়ে এখন তাঁরা কথা বলছেন। তাঁদের কিন্তু একধরনের বৃহত্তর নাগা জনগোষ্ঠী গঠনের তাগিদ তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে বলছেন, নাগা সংস্কৃতায়ণবাদ। যে জনগোষ্ঠীগুলো কোনকালেই নাগালিমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাদের আত্মস্থ করে নেবার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নাগারা বরাবরই অত্যন্ত সংগ্রামী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী। খ্রিস্টধর্ম আবির্ভাবের আগে যে খণ্ডিত নাগা অস্তিত্ব ছিল, সেটা এখন তাঁরা ভুলে যেতে চান। খ্রিস্টধর্ম তাঁদের মধ্যে যে যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছে, যেন ইতিহাস তারপর থেকেই শুরু হচ্ছে। নাগারা তার আগের ইতিহাস নিয়ে ভাবিত নন। একটা ইতিহাস নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে এখানে। 'নাগা ক্রনিকল' বলে একটা বই বেরিয়েছে। ভারত সরকারের অপ্রত্যক্ষ অর্থানুকূল্যে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোসাল সায়েন্সেস রিসার্চ' বইটা বের করেছে। সেখানে নাগা হিশেবে এমন অনেক জনগোষ্ঠীর নাম রয়েছে যাঁরা

নিজেরাই নাগা আত্মপরিচয় দিতে রাজি নন। এরকম একটা প্রক্রিয়া চলছে।

আর একটা প্রক্রিয়া চলছে উপত্যকার মেইতেই সমাজে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই হিন্দুভবনের একটা প্রক্রিয়া চলে। শ্রীহট্ট থেকে এক বৈষ্ণব শান্তদাস গোঁসাই এসেছিলেন। এরকম অনেকেই এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সাধারণ মানুষকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে চাননি, তাঁরা মূলত রাজপরিবারের লোকেদের দীক্ষিত করেছিলেন। রাজাকে যখন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করা হল, রাজা জোর করে বৈষ্ণব ধর্ম জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা ফলিয়া জারি করেন, কারও কাছে প্রাক-বৈষ্ণব কোনও পুঁথিপত্র যদি থাকে, তাহলে তাঁকে জেলে পাঠানো হবে, শাস্তি দেওয়া হবে। একটি রাতের মধ্যে সমস্ত প্রাক-বৈষ্ণব পুঁথিপত্রে অগ্নিসংযোগ করা হল। যার ফলে মেইতেই লিপি লুপ্ত হয়ে যায়, একধরনের হিন্দুভবনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়া হঠাৎ হোঁচট খায় ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।

আপনারা জানেন, ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মহারাজ বোধচন্দ্র সিং-এর সঙ্গে ভারত সরকারের উপদেষ্টা ভি পি মেনন, আসামের গভর্নর শ্রী প্রকাশের উপস্থিতিতে 'মার্জার এগ্রিমেন্ট' চুক্তি করেন। মণিপুর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দুধর্মের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চলছিল তার আগে, অন্তত দুশো বছর ধরে। মণিপুরীদের মধ্যে একটা ক্ষোভ তৈরি হয়। এইবার কিন্তু মেইতেইরা একটা উল্টোপথে হাঁটতে থাকে।

একধরনের রিট্রাইবালাইজেশন অর্থাৎ পুনঃ-উপজাতীয়করণের প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যে কোনও মেইতেই বাড়িতে যদি আপনারা যান, দেখবেন তাঁরা কপালে তিলক পরছেন, বাড়িতে তুলসি মঞ্চ রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে যে ঘরে বড়ো কর্তা থাকেন, সেই ঘরের একটি বিশেষ কোণে সানামাহি পুজো হয়। সানামাহি পুজো তো প্রাক-হিন্দু রীতি অনুযায়ী হয়। লাই-হারৌবা পরবও আগের থেকে বেড়েছে। এবং বাংলা লিপি যাতে আর ব্যবহৃত না হয় তার চেষ্টা চলছে।

আমার এক বন্ধু ইম্ফলের কাছাকাছি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন, তাঁর ছেলের বাংলা ভাষার বই ছিঁড়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। মণিপুরী লিপি স্বীকৃতি পেয়েছে-কয়েক বছর আগেই।

আমি হিন্দু হব না, হিন্দুদের সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলো আমি আত্মস্থ করব না— একদিকে এই অস্বীকার। অন্যদিকে, পিছনের পথে চলার অঙ্গীকার। কিন্তু পিছনের পথে চলতে গিয়ে একধরনের সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। সমস্যাটা মেইতেই লিপির পুনরাবিষ্কার নিয়ে, আজকে ভাষা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেই প্রাচীন লিপি দিয়ে ওই ভাষা প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

আমি যেটা বলতে চাইছি, নিজের সত্তা নির্মাণের পথটাও কিন্তু সহজ নয়,তার মধ্যেও এইসব সমস্যা লুকিয়ে আছে।

আমি অর্থনীতির দিকটাতে আসি। অর্থনীতি আমার বিষয় নয়। আমরা জানি মণিপুর একটা স্পেশাল ক্যাটেগরি স্টেট, ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান, ১০ শতাংশ রাজ্য সরকারি অনুদান। একটা রাজ্য যার নিজস্ব রাজস্ব আদায়ের রাস্তা প্রায় নেই। কোনও ভারি শিল্প নেই। খুব সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব ভারতে একটা আলোচনা-চক্রে আমি অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে বলা হয়, মণিপুরের জিরিবাম থেকে একটা রাস্তা যদি মায়ানমার দিয়ে থাইল্যান্ড পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো কলকাতা থেকে রেলপথে আমরা হ্যানয় পর্যন্ত চলে যেতে পারব। একে বলা হচ্ছে ট্রান্স-এশিয়ান রেলপথ। বলা হচ্ছে, এর ফলে ভারতবর্ষের প্রভূত উন্নতি হবে।

আমি অর্থনীতির ছাত্র নই, তবু আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের উন্নতি এক কথা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নতি আর এক কথা। ওই আলোচনা-চক্রে যিনি এটা পেশ করেছিলেন, জয়রাম রমেশ, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা তিনি। আমি তাঁর কাছে সবিনয়ে জানতে চাইব, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ওঁরা কী ভেবেছেন? আমি ওখানেও আমার প্রতিবেদনে এই সংশয় প্রকাশ করেছি।

ম. স. মণিপুর কি ধান-চালে স্বনির্ভর?

স. দা. মণিপুর শস্যে স্বনির্ভর। কিন্তু তার মানে নয় মণিপুরে না-খেতে-পাওয়া মানুষ নেই। শস্যে স্বনির্ভর হলেও তা যে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে তার গ্যারান্টি নেই। অমর্ত্য সেনের অন্যতম বক্তব্য ছিল এটা। তাছাড়া রাজ্য সরকারের ফিসকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। মার্চ মাসে আমি গিয়েছিলাম, তখন চারমাস যাবৎ সরকারি কর্মচারীরা বেতন পেতেন না। এখনও হয়তো তাই আছে। কর্মচারী, শিক্ষকেরা কর্মস্থলে আসেন না। কারণ তাঁরা টাকা পান না, আসার উৎসাহ বোধ করেন না। এটা একটা সমস্যা।

রাজনৈতিক সমস্যার কথায় আসি। এটা বিশাল সমস্যা। এক নম্বর হল মণিপুরের ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তিটাই একটা বিরাট সমস্যা।

ম. স. একটা প্রশ্ন করি, মণিপুরে গিয়ে একটা জিনিস আবছাভাবে হলেও মনে হয়েছে। ঐতিহ্যগত অর্থনৈতিক বনেদটা, কেইথেলগুলোর মধ্য দিয়ে যেভাবে গ্রামস্তর থেকে পরিচালিত হয়ে চলেছে, এটা কি সমাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম?

স. দা. এইটাই সমাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৌমভিত্তিক অর্থনীতিই মণিপুরের প্রাণশক্তি। মণিপুর তো ঝাড়খণ্ড নয়। এই ধরনের কৌমভিত্তিক সমাজের একটা গুণ হচ্ছে, এখানে কেউ না খেয়ে মারা যায় না। বাড়তি জমি যেটা আছে, সেই জমি একজন চাষ করবে, তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। একধরনের সেফটি নেট এই কৌমভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। না হলে আমরা দেখতে পারতাম বুভুক্ষু, ক্ষুধার্ত, নগ্ন মানুষ, যেরকম আমরা ঝাড়খণ্ডে দেখি। যেখানে বলা হয়, অতিরিক্ত খিদে মানুষের বিপ্লব করার ইচ্ছেটাই নষ্ট করে দেয়। এইটা বোধহয় মণিপুরে হয়নি।

রাজনৈতিক সমস্যার প্রশ্নে ফিরে আসি। অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটা নিয়ে বলছিলাম। একশ্রেণীর ইনসার্জেন্টরা মনে করছেন, এই অন্তর্ভুক্তিটা অন্যায্য। কারণ মহারাজাকে ডেকে পাঠানো হয় শিলঙে। ঠিক যেমনটা কাশ্মীরে হয়েছে, তাঁকে চাপের মুখে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। এঁদের দাবি, মহারাজা চেয়েছিলেন তিনি মণিপুরে ফিরে যাবেন, তাঁর পার্শ্ব লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তিনি সুচিন্তিত মতামত পেশ করবেন। কিন্তু তা হয়নি। সম্ভবত তিন-চারদিন তাঁকে শিলঙে রাখা হয়। এঁদের দাবি, তারপর জোর করে তাঁর

সই করিয়ে নেওয়া হয়। এইটা একটা গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে। মার্জার এগ্রিমেন্টের টেক্সট যদি দেখেন, দেখবেন, চুক্তিটা হচ্ছে ভারত সরকারের সঙ্গে একজন রাজার। কিন্তু মণিপুর তো শুধু একজন রাজার নয়। ১৯৪৭ সালে একটা কনস্টিটুশন অ্যাক্ট তৈরি হয়েছে। কোথায় গেল সেটা? কোথায় গেল তার মধ্যে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি দেওয়া? মৌলিক অধিকারগুলোর দিকে তাকালে আজকে চমকে যেতে হয়। রাজা কতদূর দিয়েছিলেন বা দিতে চেয়েছিলেন, আমি জানি না। রাজা কি সকলের ইচ্ছা চরিতার্থ করেছেন, যদি স্বেচ্ছায়ও তিনি সই করে থাকেন? একটা অ্যাসেম্বলি ছিল। তার সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেওয়া হল না। এটা আমার চোখের সামনে একটা বড়ো রাজনৈতিক সঙ্কট বলে মনে হয়েছে।

ম. স. এই গলদটা কি রাজার দিক থেকে হয়েছিল, না ভারত সরকারের দিক থেকে?

স. দা. আসলে কী হয়েছিল তা বোঝার উপায় নেই। মহারাজ বোধচন্দ্র অবশ্য পরে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তিনি চেয়েছিলেন মণিপুরে ফিরে আসতে, তিনি সাংবিধানিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। রাজা চেয়েছিলেন কিনা আমার কাছে বড়ো প্রশ্ন নয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তো আমরা মণিপুরের সেই অ্যাসেম্বলির সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। উল্টো কাজটা হয়েছিল কাশ্মীরে। সম্প্রতি প্রেমশঙ্কর ঝা-র বই বেরিয়েছে। তাতে রয়েছে, নেহরুর কাছে কিন্তু প্রশ্ন ছিল কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি নয়, কাশ্মীরের গণতন্ত্রীকরণ। তিনি বলেছিলেন, আবদুল্লাকে তোমরা জেল থেকে ছাড়ো, গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াটা চলুক। সেই একই কাজ আমরা মণিপুরে করলাম না কেন? আমার মনে হয়েছে, নেহরু কাশ্মীর সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, মণিপুর দেশটা সম্পর্কে হয়তো তাঁর ধারণা ছিল না। হয়তো সেই কারণেই তিনি ওই প্রক্রিয়ার দিকে নজর দেননি।

দ্বিতীয়ত, মণিপুরের অখণ্ডতা নিয়ে আজ একটা বড়ো প্রশ্ন এসেছে। ২০০১ সালে আমরা দেখেছি, আবার সম্প্রতি ১২ জুলাই থেকে যে ধরনের আন্দোলন, সংগঠন, তীব্র প্রতিবাদ, একটা প্রবল উত্তেজনা আমরা দেখছি, মণিপুরীদের মতে এটার কারণ হল গত দু'হাজার বছর ধরে মণিপুর একটা স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেই সার্বভৌমত্বের মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। অন্তর্ভুক্ত হবার পরে বর্মা, তদানীন্তন ব্রহ্মদেশকে, ভারত সরকার কাবু উপত্যকা দিয়ে দেয়। বৃটিশরাই আগে দিয়েছিল, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নোটিফাই করা হয়। এতে মণিপুরীদের কোনও কণ্ঠস্বর ছিল না। এইটে তাঁদের কাছে একটা সম্মানহানির প্রশ্ন। তাঁদের কাছে সবসময় ভয়— আমরা বাংলায় যাকে বলি, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়—একটু সামান্য প্ররোচনাতেই তাঁরা মনে করেন, এই বোধহয় তাঁদের রাজ্যের অখণ্ডতার ওপর আক্রমণ এল।

শেষ যে প্রসঙ্গ রাজনৈতিক সমস্যা হিশেবে আসে, তা হল, কোনও আইনের শাসন নেই। আইন আছে, সে আইন সংবিধান-বহির্ভূত আইন। আজকে পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। অত্যন্ত লজ্জার কথা এখনও আমরা আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট দিয়ে দেশ চালাই। এটা পরিষ্কার একটা কালাকানুন। এই আইন থাকটাই একটা মানবাধিকার লঙ্ঘন। তারপরে থাংজম মনোরমাকে মারা হল কি হল না, সেটা আর একটা প্রশ্ন। মনোরমা হত্যার আততায়ীর শাস্তি মণিপুরের মানুষ অবশ্যই চান। কিন্তু সেখানে তাঁরা থেমে নেই। যে আইনের বলে এই হত্যা, সেই আইনের তাঁরা অবলুপ্তি চান।

ম. স. হিজম ইরাবতের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের কথা অনেকে বলেন—

স. দা. একটা কথা বলা দরকার, এটা ঠিক ইরাবতের নেতৃত্বে মণিপুরে কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়। আজকাল কোনও কোনও জায়গায় বলা হয়, ইরাবতই ঘুমন্ত মণিপুরকে জাগিয়ে তোলেন। ইরাবতের নেতৃত্বেই 'মণিপুর কৃষক সম্মেলন' গঠিত হয়। উচ্চজাতের অভিজাত শ্রেণীর ব্রাহ্মসভার কৃষকদের ওপর ধর্মীয় কর চাপানোর বিরুদ্ধে ইরাবত আন্দোলন চালিয়েছিলেন। এসবই ঠিক। ইরাবত খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইরাবত একজন ব্যক্তি নন। তাঁর আন্দোলনকে মণিপুরের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যে ফেলেই দেখতে হবে।

১৯৩৯ সালের যে খাদ্য সঙ্কট তৈরি হয়েছিল, এটা ছিল মনুষ্য সৃষ্ট। গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব, অথচ ইম্ফলে খাদ্যের প্রাচুর্য। ১২ ডিসেম্বর মহিলারা বেরিয়ে আসেন, সম্মিলিতভাবে হাতে 'ডেক' নিয়ে প্রতিবাদ করেন। মহারাজা তখন নবদ্বীপে। মহিলাদের একমাত্র দাবি ছিল খাদ্য রপ্তানী বেআইনী ঘোষণা করতে হবে, যাতে দেশের খাদ্য বাইরে না যায়। এই বিদ্রোহ 'নুপি লান' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এইসময়ে ইরাবত ইম্ফলে ছিলেন না, তিনি কাছাড়ে ছিলেন। ফিরে আসার পর তাঁকে আন্দোলনের হাল ধরতে বলা হয়। আন্দোলনের জন্যই তিনি গ্রেপ্তার হন ১৯৪০ সালে। ১৯৪৩ সালে তিনি জেলে ছিলেন। জেলে থাকাকালীন তিনি মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হন। মণিপুরে ঢুকতে চাইলে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাঁর যে স্লোগানটা মণিপুরী ভাষায় ছিল, তার ইংরেজি হল : Farmers should be the owners of the paddy-field। আমরা বাংলায় যেটা বলি, জমি যার, লাঙল তার। কিন্তু কেবল মণিপুরের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ইরাবতের অবদানকে জড়িয়ে ফেললে, সেটা ছোটো করে দেখা হবে।

ইরাবতের আন্দোলনের আর একটা দিক ছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারণের আন্দোলন, মণিপুরের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন। সেই সময়টা ছিল চল্লিশের দশক, ভারতের কমিউনিস্টরা বিশ্ব জুড়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। তদানীন্তন কমিউনিস্টরা যেটা কেউই বুঝতে পারেননি, ইরাবত বুঝেছিলেন সেটা। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের অপরিহার্য সম্পর্ক তিনি বুঝেছিলেন। আজকেও আমার ধারণা কমিউনিস্টরা এটা বোঝেন নি। এটা না বুঝলে কমিউনিস্ট আন্দোলন উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রসারিত হবে না। ইরাবত সেই যুগে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়েও এটা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সাহস তাঁর ছিল, আজকের দিনে আমরা একথা বলতে হয়তো সঙ্কোচ বোধ করব।

ম. স. ইনসার্জেন্সি বা জঙ্গি বিদ্রোহীদের আন্দোলনেরও কি একটা ঐতিহ্য মণিপুরের রয়েছে?

হ.না. না। মণিপুরের একটা সংগ্রামী ঐতিহ্য অবশ্যই রয়েছে। খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, মণিপুরের 'সার্বভৌমত্ব'-এর জন্য আন্দোলন ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই দেখা গেছে। ইনসার্জেন্সির ঘটনাও তার পরের। সেই অর্থে ইনসার্জেন্সির ওই ধরনের কোনও অতীত নেই।

যে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি মণিপুরী মেইতেইদের মধ্যে রয়েছে, এরা কিন্তু সম্মিলিত কোনও শক্তি নয়। এদের মধ্যে স্বরের বিভিন্নতা আছে। আমি নিজে এদের তিনটে দলে ভাগ করি।

একটা দল হল পিএলএ বা ইউএনএলএফ-এর মতো শক্তি, যাঁরা আমাদের একটা প্রাক-অন্তর্ভুক্তির জায়গায় ফিরিয়ে নিতে চান। এরকম এক মণিপুরের স্বপ্ন তাঁরা দেখেন। দ্বিতীয় দল হল, যাঁরা মার্কসবাদে দীক্ষিত। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে এঁরা সমাজতন্ত্রে যাওয়ার একটা পদক্ষেপ হিসেবে দেখেন। যেমন, প্রিপাক। তৃতীয় দলটা সমস্ত গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রূপে দেখাতে চান। ১৯৯০-এর দশক থেকে এটা বেশি অনুভূত হচ্ছে। এঁদের মধ্যে রয়েছে কেওয়াইকেএল। তবে সকলেরই সাধারণ অবস্থান হচ্ছে, ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি।

হ.হ. এঁদের মধ্যে চীনা কোনও প্রভাব কি কখনও লক্ষ করা গেছে? ধরুন, চীনেও তো একটা গ্রামভিত্তিক কৃষিবিপ্লবের কথা ছিল এবং কৌমের প্রসঙ্গও একভাবে বোধহয় এসেছিল—

হ.না. তাত্ত্বিকভাবে চীন বা মাও সেতুঙের নাম এঁদের লেখাপত্রের মধ্যে আমি লক্ষ করিনি। তবে কাজকর্মের পদ্ধতিতে, ধ্যান-ধারণায় অবশ্যই এঁদের মধ্যে চীনের গ্রামভিত্তিক কৌমসমাজের আদল একটা লক্ষ করি।

মেইতেই গোষ্ঠীগুলিকে চীনের সরকারি বা অন্য তরফে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে, আমি দেখিনি। কিন্তু নাগা গোষ্ঠীগুলিকে করা হয়েছে, এতো সর্বজনস্বীকৃত।

হ.হ. মণিপুরী কৌমসমাজ ও পুরসমাজের দাবি ও আন্দোলন নিয়ে বলবেন?

হ.না. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা দুটো আলাদা সমাজ নয়, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। একটা সময় আমি ভাবতাম এ দুটো আলাদা দুটো সমাজ। আমার লেখার মধ্যে সমালোচনা করতাম, উত্তর-পূর্ব ভারতে পুরসমাজটা ঠিকমতো গড়ে ওঠে নি। আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টের মতো জঘন্য আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা যে সমাজ থেকে ওঠে, সেটা হল কৌমসমাজের প্রাণ। পুরসমাজের যে চেহারাটা আমি ভেবেছিলাম, যেখানে কৌমের চৌহদ্দি পেরিয়ে মানুষ নিজের আত্মপরিচয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, যেখানে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনটা কেবলমাত্র উপত্যকার মেইতেইদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে যায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রান্তে, নাগা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে। আমি সেটা কিন্তু হতে দেখছি না। আমি এখনও এনএসসিএন(আই-এম)-এর মতো সংগঠনের তরফে আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টের বিরুদ্ধে, আপুনবা লুপের পক্ষে দাঁড়িয়ে কোনও সতীর্থতা বা সহমর্মিতা দেখি নি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিছু নাগা সংগঠন, যেমন জিনা সারথাম নেতৃত্বাধীন নাগা উইমেনস ইউনিয়ান প্রতিবাদ করেছে। এটুকু তো যথেষ্ট নয়। কেন এই আন্দোলন উপত্যকায় একটা বিশেষ কৌমের মধ্যে রয়েছে? কেন এটা ত্রিপুরায় দেখছি না? কেন এটা উপত্যকা ছাড়িয়ে অন্যান্য অঞ্চলে দেখছি না? অর্থাৎ আমি যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, পুরসমাজটা কেবল কৌমের চৌহদ্দির মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, তাকে কাটিয়ে উঠে একটা বৃহত্তর আত্মপরিচয়ে সমৃদ্ধ হবে এবং রাষ্ট্রের খামখেয়ালীপনার মোকাবিলা করবে। আমি সেটা হতে দেখছি না।

আমি ওইসময় তীব্র সমালোচক ছিলাম। পরবর্তীকালে বিখ্যাত লেখক সঞ্জীব বরুয়া বলেন আমাকে, আমি বড়ো বেশি স্বপ্ন দেখি। আসলে যে পুরসমাজগুলো গড়ে উঠেছে, সেদিকে আমার নজর নেই। পরবর্তীকালে আমি বিষয়টা নিয়ে একটু অন্যরকম ভেবেছি, সেটা আমি খোলাখুলি আপনাদের বলতে চাই।

আমার রাষ্ট্রতত্ত্ব আমায় শিখিয়েছে পুরসমাজ ও কৌমসমাজের মধ্যে একটা মোটাদাগে তফাত করতে। সেধরনের তফাত নিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের অবস্থার বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। আমি লক্ষ্য করেছি, কৌমের ভেতর থেকে একধরনের পুরসমাজের নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে, তার সীমানা কেবলমাত্র কৌমসমাজটাকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার মধ্যে সীমিত নয়। আমি একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। মেইরা পাইবি বিরোধিতা করেছে তাঁদের সমাজের পুরুষতন্ত্রের, তাঁরা সেইসব পুরুষদের বিরোধিতা করেছেন যাঁরা উচ্ছৃঙ্খল, যাঁরা মদ্যাসক্ত, যাঁরা পরিবারের প্রতি দায়িত্বে অবহেলা করেন, তাঁদের। অর্থাৎ, এই সমালোচনাটা কিন্তু কৌমের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে। এরও তো একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। তাহলে আমি যদি বলি কৌম কৌমের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পুরসমাজ আলাদা, কথাটা তো ঠিক বলা হল না। কৌমের ভিতর দিয়েই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে একটা পুরসমাজের গোড়াপত্তন আমি লক্ষ্য করছি, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উল্টোদিকে দেখুন, পুরসমাজ প্রতিষ্ঠার একটা আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। যতদূর জানি, যে নাগা উইমেনস ইউনিয়নের কথা একটু আগে বললাম, তাঁদের তরফ থেকে মেইতেইদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় দেখবেন, নাগা ও মেইতেই সম্পর্ক আজ একটা ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে। কারণ বৃহত্তর নাগালিম হলে এই সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে ফাটল ধরবে। কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয়, মেইতেইদের প্রতিবাদটা কিন্তু এত প্ররোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের চিহ্নগুলোর ওপর নিবদ্ধ রইল। ২০০১ সালের অতবড়ো ঘটনার পরও আমি ওখানে ছিলাম, একটি নাগার গায়ে হাত পড়েনি। নাগারা উপত্যকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ হিংসার ঘটনা চোখে পড়েনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি।

আমি লক্ষ্য করছি, একদিকে একটা পুরসমাজ নির্মাণের চেষ্টা এবং অন্যদিকে কৌমের মধ্য দিয়ে একটা সংস্কারের চেষ্টা চলছে, যাতে একটা পুরসমাজের গোড়াপত্তন হয়। একটা নিশ্চিত দিশা আমি লক্ষ্য করছি এই আন্দোলনগুলোর মধ্যে।

দুটো সীমাবদ্ধতা রয়েছে এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে পুরসমাজের গোড়াপত্তনের মধ্যে। প্রথম সীমাবদ্ধতা নিয়ে বলি। কৌমের চৌহদ্দিটাকে উতরে বা ছাপিয়ে মানুষের সত্তাগত স্বাতন্ত্র্যের

অধিকারকে এতটুকু খর্ব না করে— সেটা করলে তো পুরসমাজের কোনও অস্তিত্বই থাকবে না, সে মানুষের সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে— এগোনোর চেষ্টা। যে জায়গায় সমালোচনাটা আসছে আশীষ নন্দীদের পক্ষ থেকে। সমালোচনাটা হল, আমাদের দেশে পুরসমাজের গোড়াপত্তন হচ্ছে কৌমকে ভেঙে। আমি এইরকম সিভিল সোসাইটির গোড়াপত্তন দেখতে চাই না। আমি চাই তার প্রাণশক্তি আসবে এই বিভিন্ন কৌম থেকে। এখানে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। আমি দেখেছি ২০০১ সালের ১৮ জুন উপত্যকার যেসব নাগাগোষ্ঠী রয়েছে, তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন মেইতেইদের দিকে। কিন্তু পার্বত্য মণিপুরে বা নাগাল্যান্ডে আমি সেইধরনের সহমর্মিতা লক্ষ্য করিনি।

ম. স. সহমর্মিতা দেখালে তো তাঁদের বৃহত্তর নাগালিমের দাবিটাই পুনর্বিবেচনা করতে হয়।

স. দা. সেটাই তো হচ্ছে কথা। আমি এমনভাবেই দাবিটা পেশ করব যাতে একটা একটা আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে। আমি যদি একটা অনড় অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে আমি সিভিল সোসাইটি তৈরি করতে পারব না। আমি যদি অনড় না হই, তার অর্থ এটা নয় আমার সত্তাগত স্বাতন্ত্র্যকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। একটা সীমাবদ্ধতার কথা বললাম। আর একটা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে— যেটা নিয়ে আমি একটু উৎকণ্ঠায় আছি— যেমন, মিছিল বেরোচ্ছে, মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা, একটা প্রচণ্ড ছাইচাপা আগুন যেন ফুটে বেরোচ্ছে, একটি ক্ষোভ, একটা অশান্তির পরিবেশ। এই পরিবেশ কিন্তু আলাপ-আলোচনার পক্ষে অনুকূল নয়। আমি বলছি না, প্রতিবাদ করা উচিত নয়। একটা দলবদ্ধতা, যেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথাটা ভাবা যাচ্ছে না। আমি কি এমন একজন মেইতেইয়ের কথা ভাবতে পারি, যিনি একটা অখণ্ড মণিপুরের স্বপ্ন দেখেন, তিনি হয়তো পার্বত্য মণিপুরের একটা কমন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কথা ভাবতে পারেন। একধরনের সমাধানের অর্থই হচ্ছে একটি বোঝাপড়া, একটা দেওয়া-নেওয়া। এইধরনের কণ্ঠস্বরটা কি আজকে মণিপুরে পাওয়া যাবে? দুঃখটা হচ্ছে এই, আমরা যখন মণিপুরে যাচ্ছি, যেমন আপনারাও গেছেন, আমরা বিষয়টাকে একটা দিক দিয়ে দেখছি। একটা বড়ো লম্বা চেহারায় আমরা বিষয়টাকে দেখি না।

ম. স. আপনি কি বিষয়টা মণিপুরীদের মধ্যে কখনও তুলেছেন? আন্দোলনকারীদের মধ্যে—

স. দা. মণিপুরে তো আন্দোলনকারী বলে আলাদা কিছু নেই। মণিপুরী মানেই আন্দোলনকারী। যাঁরা মণিপুরে গেছেন জানেন, একবর্ণও বাড়িয়ে বলছি না। চোখের সামনে যা দেখেছি তাই বলছি। হ্যাঁ, আমি বিচ্ছিন্নভাবে কথা বলেছি।

আজকে কাঙলা ফোর্টের সামনে বস্ত্রহীন হয়ে মহিলাদের যে প্রতিবাদ, এই প্রতিবাদটার নিশ্চয় একটা তাৎপর্য আছে। আমি চাইব এই প্রতিবাদ থেকে একটা নতুন বাতাবরণ তৈরি হোক, যেখানে আমরা সকলে আলোচনায় বসব। দুটো জিনিস আছে। একটা হচ্ছে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক একটা সমাধান। রাষ্ট্র কী সমাধান দেবে? একই জায়গা নিয়ে দুটো জনগোষ্ঠী তার দাবি দিচ্ছে। রাষ্ট্রের হাতে তো কোনও যাদুকাঠি নেই। রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমাধান পাওয়া যাবে না। সমাধান আমাদের হাতেই আছে। আমাদের আলাপ-আলোচনায় বসতে হবে। আমি বলব না যে মেইতেইরা আলাপ-আলোচনায় বসছেন না। আমি নিজে ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছি। ওঁরা এসেছেন, আমাদের কথা শুনেছেন। নিজেরা আরও বৃহত্তর আলোচনার ডাক দিয়েছেন। এরকম বেসরকারি সংস্থার কথা আমরা জানি, যাঁরা এধরনের আলাপ-আলোচনার বাতাবরণ তৈরি করেছেন। এগুলো যথেষ্ট নয়। আরও আরও দরকার। কথা না বলার মধ্যে কোনও সমাধান নেই।

ম. স. এনজিও বা বেসরকারি স্বেচ্ছাসংগঠনগুলোর মধ্যে কি এপ্রসঙ্গে কোনও ভাগ করা যায়?

স. দা. তিনটে দল রয়েছে। একটা হল, যাঁরা বিশেষ বিশেষ কৌমেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর একটা দল, যাঁরা এই যুধ্যমান পক্ষের কোনও দিকেই নন। যেমন আপনারা গিয়েছিলেন, আরও অনেকে যান। এইভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আপনারা গিয়ে কথা বলেছেন, ওঁরাও হয়তো এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে। আর একটা দল আছে, যাঁরা বিদেশি গোষ্ঠীর কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পান। বিদেশি গোষ্ঠীর কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পাওয়া মানেই যে সবকিছু শেষ, তাও নয়। কিন্তু ওঁরা কাজ করেন বিদেশি অঙ্গুলি হেলনে। আমি খুবই বিপন্ন বোধ করি, যখন ডিমাপুর ইত্যাদি জায়গার বিস্ফোরণ ঘটার পর এফবিআই তদন্ত করতে চাইছে। আমি অবাক হব না, যদি দুদিন বাদে তাঁদের তদন্ত করার ভার দেওয়া হয়। তাঁরা আমাদের হয়ে তদন্ত করবেন, আলোচনার বাতাবরণ তৈরি করবেন, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বিদেশি অর্থ মানেই খারাপ তা নয়। কিন্তু অ্যাজেন্ডাটা কী? বিদেশিরা যেমনটি চান সেভাবে কাজটি করা হবে? সেখানে আমার আপত্তি আছে।

ম. স. উন্নয়নের সঙ্গে তো একটা কর্পোরেট যোগাযোগ রয়েছে।

স. দা. মায়ানমার এবং এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যে চেষ্টা চলছে, তাতে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ কেইথেলগুলোর অস্তিত্ব কতটা টিকবে জানিনা। এই যে পোশাক মণিপুরীরা তৈরি করে, সে তো হারিয়ে যাবে। বিশ্বায়নের এবং বাজারী অর্থনীতির হাওয়ায় এই গ্রামসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা কতটা টিকে থাকবে, এটা নিয়ে আমার একটা শঙ্কা রয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি মণিপুরের কাগজ সাঙ্গাই এক্সপ্রেস, ইম্ফল ফ্রি প্রেস, ইত্যাদিতে এই দরজা খুলে দেওয়ার নীতির খুব প্রশংসা চলছে। সমালোচনামূলক লেখা আমি দেখিনি। ভয়টা সেখানে।

ম. স. আচ্ছা, সংসদীয় রাজনীতি এবং দলগুলো সম্পর্কে বলবেন?

স. দা. সংসদীয় রাজনীতি এবং জঙ্গি রাজনীতি নিয়ে আমরা একটা তফাত করি। কিন্তু এই তফাত দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিকে বোঝা যাবে না। এই দুই রাজনীতির মধ্যে একটা অদ্ভুত লেনদেন রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতে। সংসদীয় রাজনীতিতে যেমন জঙ্গি রাজনীতি এসে পড়ছে, উল্টোটাও ঘটছে। মণিপুরে সংসদীয় রাজনীতি কেউ আলোচনার বিষয়ই মনে করেন না। অন্য জায়গার একটা উদাহরণ দিই। একটি বিশেষ জঙ্গি গোষ্ঠী একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে সমর্থন করছে। অর্থাৎ সেই জঙ্গি গোষ্ঠী চাইছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসুক।

একভাবে তাঁরা সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। আবার তাঁরা চাইছেন, সংসদীয় রাজনীতিটা এমনভাবে পরিচালিত হোক যাতে তাঁদের সুবিধা হয়। যেমন ধরুন, আসামে ১৯৮৫ সালে অসম গণপরিষদের ক্ষমতালাভ আলফা-র সহায়তায় সম্ভব হয়েছিল। গত নির্বাচনে অসম গণপরিষদের প্রার্থীরা আলফা-র আক্রমণের শিকার হন। উল্টোটাও ঘটে। সংসদীয় রাজনীতিবিদেরা জঙ্গি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, অথবা সাংবাদিক সঞ্জয় হাজারিকা যেমনটা বলেছিলেন, একধরনের 'হ্যান্ড ইন গ্লাভ' সম্পর্ক রয়েছে। মণিপুরেও বহু মন্ত্রী,সাংসদ, নেতা জঙ্গিদের সঙ্গে যুক্ত, মদতপুষ্ট এবং আশির্বাদধন্য। একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছে।

মণিপুরে সংসদীয় বা দলীয় রাজনীতির মধ্যে আলাদা বিশেষত্ব কিছু নেই, সবই একটা জাতীয় রাজনীতির প্রতিচ্ছবি। আমি যদি সংসদীয় রাজনীতি নিয়ে গবেষণা চালাই, আমার মনে হবে, উত্তর-পূর্ব ভারতের মতো জাতীয়তাবাদী বোধহয় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাণশক্তি তো এই প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির মধ্যেই নেই। প্রাণশক্তিটা তো এর বাইরে। সেই বৃহত্তর রাজনীতির চৌহদ্দিটাকে যদি আমি বুঝতে না পারি, তাহলে আলোচনাটা আংশিক থেকে যাবে। আমি তাই প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান-বহির্ভুত, দুটো দিক থেকেই বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করেছি।

ম. স. জাতপাতের বিষয়টা কেমন?

স. দা. আপনি যদি মণিপুরীদের নামগুলো দেখেন, যেমন ধরুন, থাঙজাম মনোরমা— প্রথম নামটা 'ক্ল্যান নেম' বা গোষ্ঠীগত নাম। এই ক্ল্যানের অস্তিত্ব কিন্তু মণিপুরে হিন্দুভবনের মধ্য দিয়ে চলে যায়নি। হিন্দুধর্ম আসার ফলে একদিকে মণিপুরীরা যেমন বৈষ্ণব হয়েছেন, আর একদিকে জাতপাতও এসেছে। আমি বলেছিলাম মেইতেইরা হিন্দুভবনের রাস্তা থেকে পিছু হাঁটছেন। যতই পিছু হাঁটছেন,ততই কৌমসমাজের একটা একত্রিত সঙঘবদ্ধ চেহারা তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন। জাতপাতের যে ভেদাভেদ, সেটা উত্তরণের পথে তাঁরা সক্ষম হয়ে উঠছেন। যত সংগঠিত প্রতিবাদ লক্ষ্য করছি ততই জাতপাতের বিষয়টা মন্দীভুত হচ্ছে। মণিপুরী সমাজ সত্যিই একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

ম. স. মণিপুরের নাচ, পথনাটক—

স. দা. আমি ততটা ওয়াকিবহাল নই। তবে নৃত্যের আঙ্গিক দেখে মনে হয়েছে কৌমসমাজের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। মণিপুরে খোলের ব্যবহার এবং খোলের সঙ্গে শরীর-নির্ভর নৃত্য, এটা একটা ক্লাসিকাল ড্যান্সের মর্যাদা পেয়েছে।

আর যেটা ব্যাপার, সেটা হল মণিপুরী পথনাটক, সুমংলীলা। এ নাটকের কোনও স্ক্রীপ্ট থাকে না। যাঁরা অভিনেতা তাঁরা দর্শকদের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকেন। আমি কয়েকটা সুমংলীলা দেখেছি। এটা মূলত সাধারণ মানুষের। এটা দরবারী সংস্কৃতি নয়। এটা পথে-ঘাটে চলে। এই থিয়েটার কোম্পানীগুলো একমাস বা দু'মাস ধরে পথে পথে প্রদর্শন করেন। এগুলোতে মানুষের দুঃখ-বেদনা, ইনসার্জেন্সি, অন্তর্ভুক্তির মতো রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসে। একই বিষয়ের দুটো সুমংলীলা কখনও এক হতে পারে না, কারণ এটা উপস্থিতমতো প্রস্তুত।

থিয়েটারের আর একটা মার্জিত ধারা রয়েছে। কানহইয়ালাল থেকে যেটার শুরু, আজকে রতন থিয়াম পর্যন্ত— সেটার প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশি বলা যাবে না। এটা থিয়েটার-দেখা মানুষের মধ্যে রয়েছে। সুমংলীলা গরিব-গুর্বো মানুষদের জন্য।

ম. স. যাঁরা সুমংলীলা করেন, তাঁদের কীভাবে চলে?

স. দা. এটা একেবারেই মাদারী কা খেল, রামলীলার মতো। পথেঘাটে অভিনয় করেই উপার্জন। মেইতেইদের সুমংলীলা কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলেও চলে। সুমংলীলার বিষয়গুলো পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, আজকের বিষয়গুলো রাজনৈতিক।

মনোরমা হত্যার প্রতিবাদ

আন্দোলনের দিনলিপি

১০ জুলাই ২০০৪ রাত সাড়ে বারোটার সময় ইম্ফলের বামন কাম্পু মাখা লেইকাই নামক গ্রামের প্রয়াত থাঙজাম বীরহরির বাড়িতে আসাম রাইফেল্স-এর সতরতম ব্যাটালিয়নের কয়েকজন সৈন্য উপস্থিত হয়। বাড়ির সদর দরজা ভেঙে ঢুকে ওদের একজন মণিপুরী ভাষায় বীরহরির কন্যা বত্রিশ বছর বয়সী থাঙজাম মনোরমা, ওরফে হেনথয়-এর খোঁজ করে। তারপর মনোরমাকে ওঁর শোবার ঘর থেকে টেনে বারান্দায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে শুরু হয় ওঁর ওপর অত্যাচার। এরপর হাবিলদার সুরেশ কুমার নিজে সই করে এবং রাইফেলম্যান টি. লোথা এবং অজিত সিং-এর সাক্ষী হিসেবে সই নিয়ে একটি অ্যারেস্ট মেমো মনোরমার মা থাঙজাম খুমানলেইমা দেবীর হাতে দেন। মনোরমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর জন্য একটা সোয়েটার ও একটা চাদর চেয়ে নেওয়া হয়। তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটে।

১১ জুলাই পরদিন মনোরমার বুলেটবিদ্ধ, রক্তাক্ত মৃতদেহ তিন কিমি দূরে ইয়াইফারোক মারিং গ্রামের কাছে টিলার নীচে গ্রামবাসীরা পড়ে থাকতে দেখে। খবরটা বামন কাম্পুতে ওঁর পরিবার ও প্রতিবেশীদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যায়। বাড়ির লোকেরা দেখে মৃত মনোরমার অন্তর্বাসের হুক ছেঁড়া রয়েছে, স্তনে ক্ষতচিহ্ন এবং শরীরের গোপনাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। ওঁকে হত্যা করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছে, এই অভিযোগে পরিবারের লোকেরা ওঁর মৃতদেহ নিতে অস্বীকার করে। স্থানীয় ইরিলবাঙ পুলিশ স্টেশনের পক্ষ থেকে মৃতদেহটি সরকারি হাসপাতাল RIMS মর্গে আনা হয়। সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দেহটি পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করা হয়।

ইতিমধ্যে বামন কাম্পুর অধিবাসীরা ওইদিন দুপুরবেলা ইম্ফল-ইরিলবাঙ রোডে অবরোধ করে। সন্ধ্যা ৬-৩০টা নাগাদ কয়েকশত মশালধারী মহিলা, মেইরা পাইবি এবং স্থানীয়

মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে মিছিল করে রওনা হয়। পুলিশ মিছিলের পথ অবরুদ্ধ করে। দশজনের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এক স্মারকলিপির মাধ্যমে দুটি দাবি পেশ করে। এক, মোরীসের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। দুই, মনিপুর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA) রদ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দাবি মেনে নেন, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে দ্বিতীয় দাবি নাকচ করেন। পরের দিন, অর্থাৎ বারোই জুলাই বামন কাম্পুতে এক প্রকাশ্য জনসভায় পরবর্তী প্রতিবাদ-কর্মসূচী স্থির হবে, ঘোষণা করা হয়। ইম্ফল-ইরিলবাঙ রোডে অবরোধ চলতে থাকে।

১২ জুলাই আসাম রাইফেল্‌স বিবৃতি দিয়ে জানায়, মনোরমার শ্লীলতাহানি এবং তাঁকে অত্যাচারের অভিযোগ মিথ্যা। মনোরমা এক 'বেবি ফেস্‌ড কিলার', বহু নিরাপত্তা রক্ষীকে সে খুন করেছে এবং ২০০৩ সালে লিলঙ ব্রীজে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সে যুক্ত ছিল। ১১ জুলাই গ্রেপ্তারের সময় ওঁর কাছে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড, একটা রেডিও সেট এবং কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া গেছে। একটা লুকোনো AK47 রাইফেল উদ্ধার করার সহায়তা করার জন্য মনোরমা সৈন্যদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। মাঝখানে প্রস্রাব করার জন্য গাড়ি থেকে নেমে পালাতে গেলে সৈন্যরা গুলি চালায়। স্থানীয় পুলিশের কাছে মৃতদেহ তুলে দেবার সময় পর্যন্ত সৈন্যরা মৃতদেহর কাছে অপেক্ষা করেছে।

এই বিবৃতি আগের দিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের সঙ্গে বহুলাংশে মেলেনি।

চব্বিশটি সংগঠন এইদিন মধ্যরাত থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল ঘোষণা করে। মনোরমা হত্যার প্রতিবাদে ইম্ফলের সর্ববৃহৎ মায়েদের বাজার 'খোয়াইরামবান্দ বাজার' দুপুর ১টা থেকে বন্ধ রাখা হয়। ইরাবত ভবনে একটি 'প্রেস মীট'-এ 'মনিপুর কেইথেল নুপি মারূপ' ভবিষ্যত প্রতিবাদ কর্মসূচী ঘোষণা করে। রাজ্যের সমস্ত 'মেইরা পাইবি' সংগঠনকে আন্দোলনে শামিল হবার আহ্বান জানানো হয়। একই সঙ্গে আটই জুলাই সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা সেইজ্যাঙ গ্রামের ষাট বছর বয়স্ক পশুপালক জামখোলেট খোঙসাই-কে হত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়।

১৩ জুলাই মনিপুর সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সি. উপেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনকে এক মাসের মধ্যে মনোরমার মৃত্যু সংক্রান্ত তদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়।

শান্তিপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘটের ফলে ইম্ফলের খোয়াইরামবান্দ বাজার সহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ লামলঙ বাজার, তেরা বাজার, কোয়াকেইথেল ইত্যাদি বাজার জনশূন্য হয়ে যায়। বহু জায়গায় রাস্তা অবরোধ করা হয়। সন্ধ্যায় প্যালেস গেটের কাছে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও আসাম রাইফেল্‌স প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। পুলিশ প্যালেস গেট অঞ্চলে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলে স্থানীয় মেইরা পাইবি নেত্রীরা তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

১৪ জুলাই ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। উপত্যকার বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে অবস্থান-বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারি ব্যক্তিদের কুশপুত্তল দাহ করা হয়। বত্রিশ সংঠনের মোর্চা 'আপনবা লুপ' সরকারের বিচারবিভাগীয় তদন্তকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করে। সেনাপতি জেলায় নাগা স্টুডেন্ট্‌স ফেডারেশনের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে আওয়াজ তোলে: ১. সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করো; ২. নাগা জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে দাও।

আসাম রাইফেল্‌স কর্তৃপক্ষ মনোরমা হত্যার ঘটনা নিয়ে তদন্তের জন্য একটি কোর্ট অব এনকোয়ারি গঠন করে।

১৫ জুলাই বারোজন মহিলা সকাল দশটার সময় ঐতিহাসিক কাঙলা দুর্গের[৩] সামনে গায়ের পোশাক খুলে ফেলে অভূতপূর্ব এক বিক্ষোভ কর্মসূচীতে শামিল হন। তাঁদের হাতে ছিল ব্যানার : ১. ভারতীয় সেনা আমাদের ধর্ষণ করো; ২. এসো, আমাদের মাংস খুবলে খাও। দুর্গের বিশাল লৌহ তোরণ নাড়িয়ে দিয়ে ওই মহিলারা গর্জন করে ওঠেন : আমাদের হত্যা করো; আমাদের ধর্ষণ করো ; আমরা প্রত্যেকে মনোরমার মা। দুর্গের ভিতর আসাম রাইফেল্‌স-এর সেনারা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেই বিক্ষোভ দেখতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর দুর্গের বাইরে থেকে মণিপুর পুলিশের একটি বাহিনী এসে এঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মণিপুর সরকার বেলা ১১ টায় অতর্কিতে ইম্ফলে কার্ফু ঘোষণা করে। স্থানীয় কেব্‌ল নেটওয়ার্ক ISTV-র সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।

১৬ জুলাই সকাল থেকে প্রায় সমস্ত অঞ্চলের মানুষ, মূলত মহিলারা, কার্ফু অগ্রাহ্য করে মিছিলে পা মেলায়। ব্যাপক পুলিশী বন্দোবস্ত, লাঠিচার্জ, রাবার বুলেটের গুলি এবং কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করে অসংখ্য মিছিল এবং যুবকদের পথ অবরোধ গড়ে ওঠে। দুপুর ১২.৩০টা নাগাদ খাম্বাম লেইকাই এবং চিঙমেইরঙের মাঝামাঝি জাতীয় সড়ক-৩৯-এর ওপর প্রায় চার হাজার মানুষের মিছিল ইম্ফল শহরের কেন্দ্রে পৌঁছতে চাইলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে তাকে ছত্রভঙ্গ করে। বহু মানুষ কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং রাবার বুলেটের গুলিতে আহত হয়। ১৫ জুলাইয়ের বিক্ষোভকারী মহিলাদের 'মা' আখ্যা দিয়ে তাঁদের কর্মসূচীকে 'নুপি লা' অর্থাৎ মায়েদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিং কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হন। থৌবাল এবং বিষ্ণুপুরেও কার্ফু জারি হয়।

নাগা স্টুডেন্ট্‌স ফেডারেশনের ডাকে চব্বিশ ঘন্টা ধর্মঘট পাহাড়ী জেলা সেনাপতি, উখরুল, চান্দেল, তামেঙলঙ এবং সংলগ্ন নাগাল্যান্ডের অঞ্চলগুলিতে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যায়।

১৭ জুলাই কার্ফুর মধ্যে স্বতস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল, পথ অবরোধ, অবস্থান এবং কুশপুতুল দাহ কর্মসূচী চলতে থাকে সর্বত্র। চূড়াচাঁদপুরে ১৪৪ ধারা জারি করার প্রতিবাদে মহিলারা পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করে। মেয়েদের বাজারগুলিতে সবচেয়ে বেশি বিক্ষোভ দেখা যায়।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় সভার আয়োজন করেন।

জুলাই মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য কার্ফু শিথিল করা হয়। পূর্ব ইম্ফলের কোঙবা, খুরাই, ওয়াংখেই, হেইঙগাঙে এবং পশ্চিম ইম্ফলের কোয়াকেইথেল, মোইরাঙখম, সিঙজামেই, তেরাবাজার, ওয়াহেঙবাম লেইকাই, খোয়াথঙ এবং চিঙমেইরঙে রাত ৮টায় মশাল মিছিলের পথ অবরোধ করে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নতুন করে সি আর পি এফ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের দাঙ্গা-দমন বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। অহিংস আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র দমন-পীড়ন চলতে থাকে। সীমান্তবর্তী মোরেহ্ এবং মাকলাঙ-এ মহিলাদের মশাল-মিছিল ও বিক্ষোভ শুরু হয়। জিরিবাম-এ অল মণিপুর স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন (AMSU) বন্‌ধের ডাক দেয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের কিছু অংশে উপদ্রুত এলাকা স্ট্যাটাস তুলে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি AFSPA তুলে নেওয়ার দাবি জানায়।

জুলাই গণবিক্ষোভের মধ্যেই দিল্লী থেকে ইম্ফলে পরিদর্শনে আসেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ জয়সওয়াল। তাঁর আসার পরই সিঙজেমাই-এর MLA হেমচন্দ্রকে রাজভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ দেখানোর জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লীতে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী মণিশ গোস্বামী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC)-এর কাছে মনোরমা হত্যা এবং AFSPA রদ করার প্রশ্নে আবেদন জানান। AFSPA তুলে নেওয়ার দাবিতে খঙজম সার্কেল-এর মেইরা পাইবি মহিলারা কয়েকজন আত্মাহুতির পথ নেবার কথা ঘোষণা করেন। ইম্ফলের খামনাম কেইথেল-এর বিক্ষোভরত মহিলারা একজন পুলিশ অফিসারের অত্যন্ত প্ররোচনামূলক উক্তির প্রতিবাদ করে। সকাল থেকে বিক্ষোভরত থাঙমেইবান্দ অঞ্চলের সাতটি মেইরা পাইবি সংগঠনও একই ধরনের অভিযোগ জানায়। কার্ফুর মধ্যেই রাতে ওইনাম মেইরা পাইবি লুপের প্রায় এক হাজার মহিলা মশাল-মিছিল করে মাইবাম লোকপা চিঙ সেনা-ঘাঁটির কাছে বিক্ষোভ জানায়। কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রাতে কুম্বি নগর পঞ্চায়েত অফিস পুড়িয়ে দেয়। নাম্বোলেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে।

জুলাই কার্ফু প্রত্যাহার এবং ৬জন কর্মীর মুক্তির দাবিতে ইম্ফলের কেইবি আওয়াঙ লেইকাই-এর ৬ জন কর্মী লাগাতার ভুখ হরতাল শুরু করেন। টিডিম ময়দানে বত্রিশ সংগঠনের যৌথ সভা পুলিশ বানচাল করে দেয়। সকাল থেকে উপস্থিত জনতাকে পশ্চিম ইম্ফলের জেলা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইনডিজেনাস পপুলেশন'-এর ২২তম অধিবেশনে মণিপুরের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং মনোরমা হত্যার বিষয়টি উত্থাপন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পনরই আগষ্টের মধ্যে AFSPA আংশিক বা সম্পূর্ণ তুলে নেবার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নেবে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০০৪ সালের মধ্যে কাঙলা দুর্গ থেকে আসাম রাইফেল্‌স-কে সরিয়ে নেওয়া হবে। এছাড়া, আসাম রাইফেল্‌স-এর মনোরমা হত্যা সংক্রান্ত কোর্ট অব এনকোয়ারিও ২৭ জুলাই-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

রাজভবনের সামনে ধর্ণায় বসতে গেলে MLA লাইশোম ইবোমচা-কে রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

২২ জুলাই দিল্লীতে নাগা, কুকি উপজাতি এবং আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় চারশত ছাত্র AFSPA প্রত্যাহার এবং মনোরমা হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করে সংসদ ভবনের দিকে রওনা হলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মণিপুরে গণ আন্দোলন চলতে থাকে। বিষ্ণুপুর থৌবল এবং ইম্ফলে দিনের বেলা কার্ফু আংশিকভাবে শিথিল করা হয়।

বিজেপি নেতা এবং পুর্বতন মুখ্যমন্ত্রী আর.কে.দোরেন্দ্র AFSPA প্রত্যাহারের বিষয়টিতে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে আলোচনার দাবি জানান। ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান উইমেন (NFIW) মণিপুরে মনোরমা হত্যাসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC)-কে বিচারের দাবি জানায়।

মনোরমার মায়ের কাছে রাজ্যের MLA ও মন্ত্রীদের সাতজনের একটি দল্ গিয়ে মনোরমার দেহ গ্রহণ করার আর্জি জানায়। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দ্বিতীয়বার মৃতদেহের পোষ্টমর্টেম ও DNA পরীক্ষার দাবি জানান।

সীমান্তবর্তী মোরেহ্ শহরে ইমা কেইথেল থেকে মহিলাদের মশাল-মিছিল পথ-পরিক্রমা করে।

২৩ জুলাই ইম্ফল সহ পার্শবর্তী অঞ্চলে কার্ফু সকাল চারটে থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত শিথিল করা হয়। সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে সাংবাদিকরা মণিপুর রাইফেল্‌স-এর চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। লেখক ও শিল্পীরা AFSPA প্রত্যাহারের দাবি জানায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

২৪ জুলাই দুপুর সওয়া বারোটার সময় মণিপুর ফরওয়ার্ড ইয়ুথ ফ্রন্ট (MAFYF)-এর পাঁচজন কার্যনির্বাহী সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের প্রবেশ পথের ওপর নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন। নিরাপত্তা রক্ষীরা আগুন নিভিয়ে ওঁদের সরকারি হাসপাতাল RIMS-এ পাঠিয়ে দেয়।

RIMS-এ দ্বিতীয়বার পরীক্ষার পর বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে মনোরমার মৃতদেহ দাহ করা হয়। আপুনবা লুপ এইদিন মধ্যরাত থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে চব্বিশ ঘন্টার ধর্মঘটের ডাক দেয়।

রাজভবনের সামনে আচমকা বিক্ষোভ জানাতে গেলে মণিপুর ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট্স ইউনিয়নের সভাপতি সহ চারজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। লামলঙ বাজার এলাকায় মহিলারা তাঁতের তেম হাতে নিয়ে মিছিল করে। অল মণিপুর স্টুডেন্ট্স ইউনিয়ন সহ তেরটি সংগঠনের ডাকে সিঙজেমাই-তে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী নেওয়া হয়। মহিলারা সিঙজেমাই বাজার বন্ধ রাখে।

২৫ জুলাই মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে যান। সংসদীয় বিরোধী দলগুলি তিনদিনের মধ্যে 'উপদ্রুত এলাকা' ঘোষণা প্রত্যাহার করার দাবি জানায়।

আন্দোলনকারীরা প্রকাশ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের পতাকা

পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্যেই মনোরমার মা জানান, AFSPA প্রত্যাহার না করা হলে মনোরমার শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়া করা হবে না।

২৬ জুলাই রাজভবনের সামনে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অহিংস আন্দোলনের ওপর পুলিশী দমন-পীড়ন চালানো হয়। আহতদের RIMS হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২৭ জুলাই তিনহাজারের বেশি বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী, মেইরা পাইবি এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাকর্মীরা খুরাই লামলঙ-এর দিকে মিছিল করে এগোতে গেলে সাওমবাঙ গেটের কাছে পুলিশ লাঠি-চার্জ ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। মোরেহ্-তে দুইজন কুকি আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করার পর বিক্ষোভ দমন করতে কার্ফু জারি করা হয়।

আপুনবা লুপের ডাকে ২৯ জুলাইয়ের প্রস্তাবিত গণমিছিলে বিরোধী দলগুলি যুক্ত হবার কথা ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ও লন্ডনে মণিপুরীরা বিক্ষোভ দেখায়।

আসাম রাইফেল্‌স-এর কোর্ট অব এনকোয়ারি প্রতিবেদনে মনোরমা হত্যা নিয়ে বিস্তৃত উল্লেখ না করে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির কথা স্বীকার করা হয়।

পার্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চলের নাগা,কুকি ও মণিপুরী (মিতেই) ছাত্র সংগঠনগুলি AFSPA সহ সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে ইম্ফলে মিলিতভাবে আলোচনা করে।

২৮ জুলাই ইম্ফলের সর্ববৃহৎ ইমা কেইথেল খোয়ারিমবান্দ বাজারে প্রায় আড়াই হাজার মহিলার জমায়েতে মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিং-এর কুশপুতুল দাহ করা হয়। উখরুল জেলায় ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (UNLF) গেরিলারা তিনজন আসাম রাইফেল্‌স সেনাকে হত্যা করে।

উপেন্দ্র কমিশন মনোরমার মৃতদেহ যেখান থেকে পাওয়া গেছে সেই জায়গাটি পরিদর্শন করে।

২৯ জুলাই থৌই ময়দান থেকে প্রায় এক লক্ষ মানুষ মিছিলে শামিল হয়। পুলিশী দমনপীড়নের ফলে ১৫২জন গুরুতরভাবে আহত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অবস্থান-বিক্ষোভ করে গ্রেপ্তারবরণ করেন।

৩০ জুলাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনেভা'র অধিবেশন ঘোষণা করে, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিরা সন্ত্রাসবাদী নয়। মুখ্যমন্ত্রী ফের দিল্লীর দ্বারস্থ হন। দিল্লীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মানুষেরা বিক্ষোভ দেখায়।

৩১ জুলাই আপুনবা লুপ ২৯ জুলাই AFSPA প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে চব্বিশ ঘণ্টা সময়সীমা ধার্য করেছিল। সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-গ্রেপ্তারবরণ কর্মসূচীতে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেয়।

পূর্বতন মন্ত্রী এবং বর্তমান MLA এন.লোকেন ১৫ আগষ্টের মধ্যে AFSPA প্রত্যাহার না করলে পদত্যাগ করবেন ঘোষণা করেন।

মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন ছাত্র এবং ২জন ছাত্রী মহাত্মা গান্ধীর ছবি বুকে নিয়ে বিকাল ৪.১৫টায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে প্রবেশ করতে গেলে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১ আগষ্ট খুরাই লামলঙ বাজারের কাছে পাঁচশত বিক্ষোভকারী স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তারবরণ করতে গেলে তাদের ওপর রাবারের বুলেট চালানো হয়।

২ আগষ্ট গণকারাবরণের চাপে রাজ্য সরকার থৌবলের ফুড কর্পোরেশন গোডাউনে অস্থায়ী জেল তৈরি করে। মণিপুর পিপল্‌স পার্টি ও বিজেপির কর্মীরা ভুখ হরতাল শুরু করে। প্রায় একশত নর্থ ইষ্টার্ন স্টুডেন্ট্‌স অর্গানাইজেশন (NESO) কর্মী দিল্লীতে গ্রেপ্তারবরণ করে।

৩ আগষ্ট মণিপুরের আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ সামনে চলে আসতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেন।

৪ আগষ্ট পনরজন বিরোধী দলের MLA বিধানসভা ভবনের সামনে ১৪৪ ধারা অমান্য করে গ্রেপ্তারবরণ করেন। গণআন্দোলন এবং দমনমূলক ঘটনা বাড়তে থাকায় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে ফেরার পর ইম্ফলে ফের দুপুর দেড়টা থেকে কার্ফু বলবৎ হয়। আকস্মিক কার্ফু জারি হওয়ায় পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এ. সূর্য পুলিশের গুলিতে মারা গেলে আপুনবা লুপ প্রতিবাদ জানায়।

৫ আগষ্ট সরকারি কর্মচারীরা গণ ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। সাড়ে তিন বছর ধরে অনশনরত ইরম শর্মিলা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি সেই আবেদন প্রত্যাখান করেন। MAFYF কর্মীরা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স অফিস ঘেরাও করে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করেন।

৬ আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রী আপুনবা লুপের সঙ্গে কথা বলার জন্য সংবাদমাধ্যমকে ইঙ্গিত দেন। পাঁচজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গি সংগঠনগুলির কাছে আলাপ-আলোচনার পথে আসার জন্য আবেদন করেন। আসামের হোজাই অঞ্চলে বারোটি মিতেই সংগঠন মিছিলের কর্মসূচী নেয়।

৭ আগষ্ট ৯ আগষ্ট থেকে গণ আইন-অমান্য শুরু করার ডাক দেয় আপুনবা লুপ। সরকারও সমস্ত আন্দোলনকারী সংগঠনের নেতাদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়। শত শত আন্দোলনকারী গ্রেপ্তারবরণ করতে গেলে পুলিশের হাতে আহত ও গুলিবিদ্ধের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

৮ আগষ্ট জেলভরো আন্দোলনের শেষদিনেও দশজন আহত হয়। ১৬ জুলাই থেকে RIMS ও জে.এন.হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আহতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭৫ জন।

৯ আগষ্ট আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেন প্রায় আশি শতাংশ সরকারি কর্মচারী।

আসাম রাইফেল্‌স-এর তলবপ্রাপ্ত সেনারা নিরাপত্তার অজুহাতে কমিশনের সাক্ষ্যে অনুপস্থিত থাকে।

আত্মগোপনকারী সংগঠন পিপল্‌স লিবারেশন আর্মি (PLA) এবং রেভুল্যুশনারী পিপল্‌স ফ্রন্ট (RPF) মণিপুরের গণআন্দোলনকে সমর্থন করার পাশাপাশি ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন বয়কট করার ডাক দেয়।

১০ আগষ্ট বাঙালোরের মণিপুর মিতেই অ্যাসোসিয়েশন মণিপুরের

শিল্পী : থাঙজাম অশ্বিনীকুমার

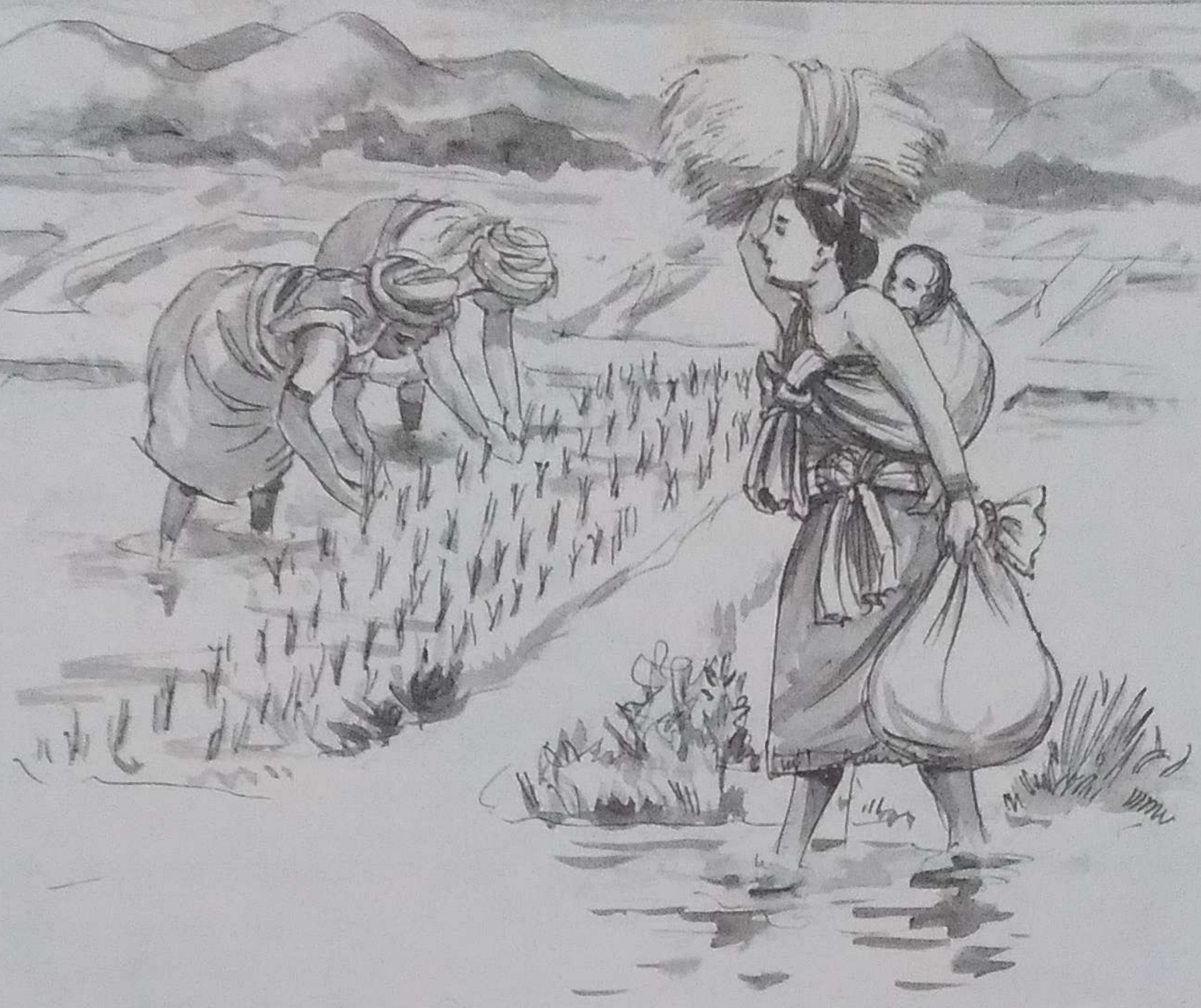

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও চাষের কাজ করে। কিন্তু মহিলারা লাঙল ধরে না। ধান হলো প্রধান ফসল।

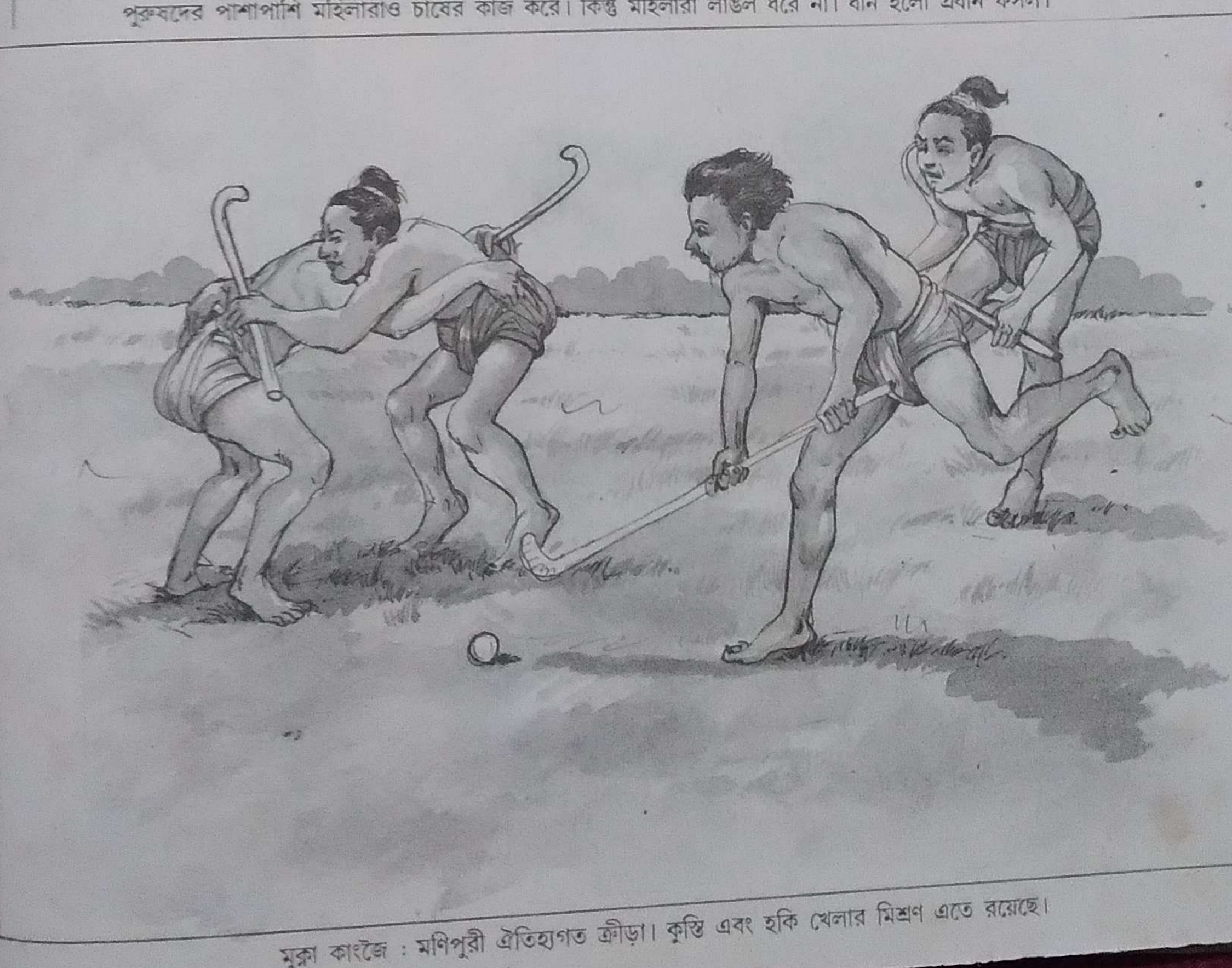

মুক্কা কাংজৈ : মণিপুরী ঐতিহ্যগত ক্রীড়া। কুস্তি এবং হকি খেলার মিশ্রণ এতে রয়েছে।

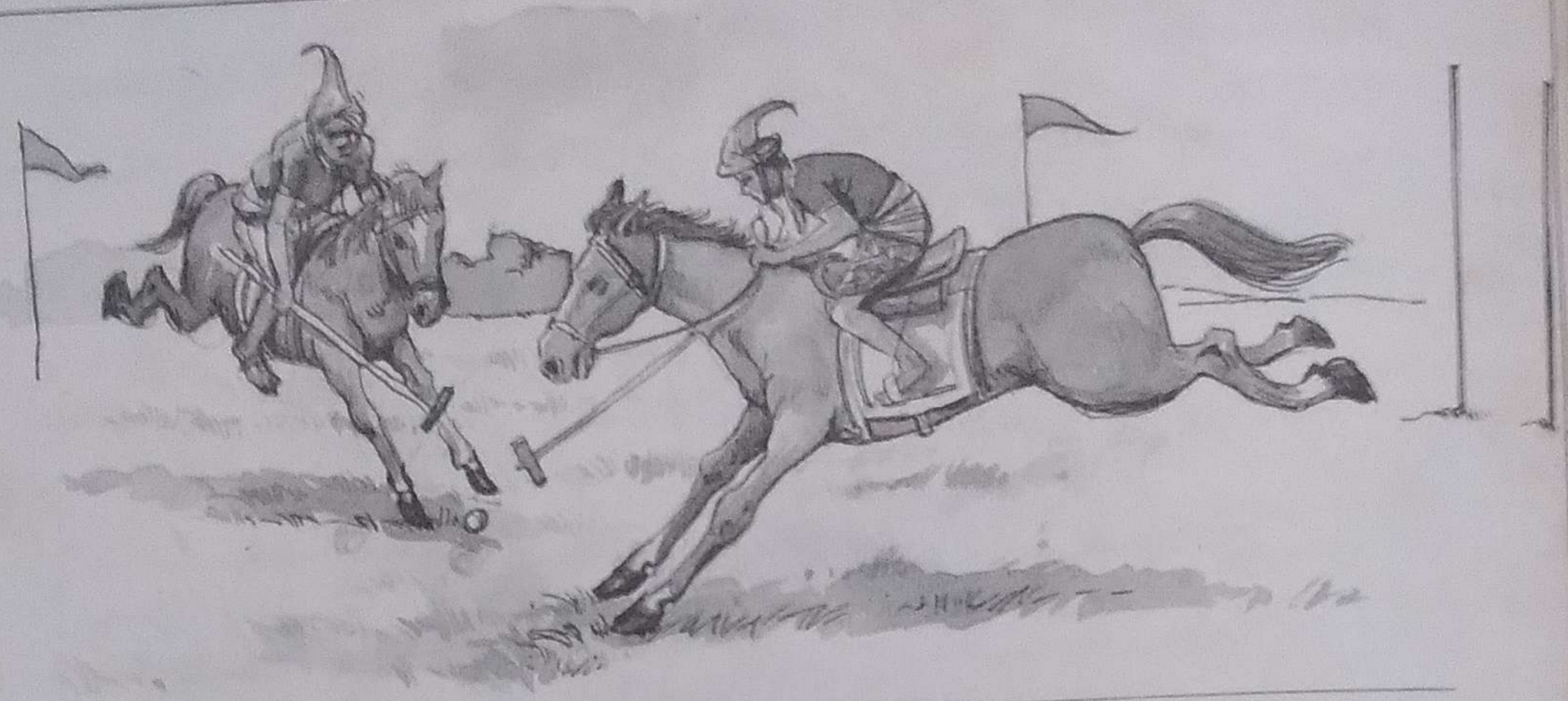

অভিজাতদের ঐতিহ্যমন্ডিত আমোদ পোলো খেলা। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা খাগেনবা-র আমলে মণিপুরে এই খেলার প্রচলন হয়।

মণিপুর উপত্যকায় ভোরবেলা ঘরের বারান্দায় সূর্য-প্রণাম করছেন মিতেই গৃহবধূ।

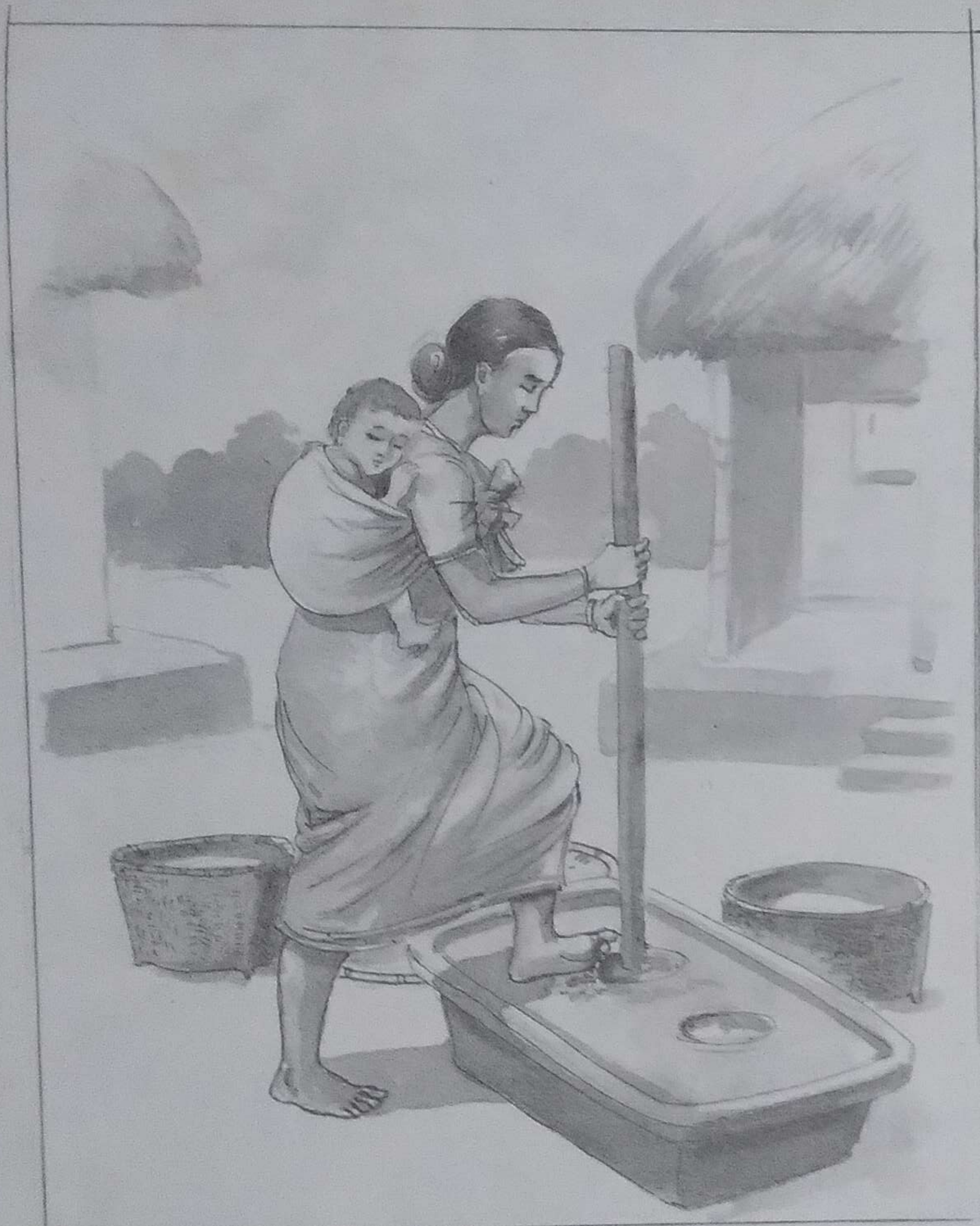

ঐতিহ্যগত ধানছাঁটার ব্যবস্থা। এখন এর প্রচলন কম।

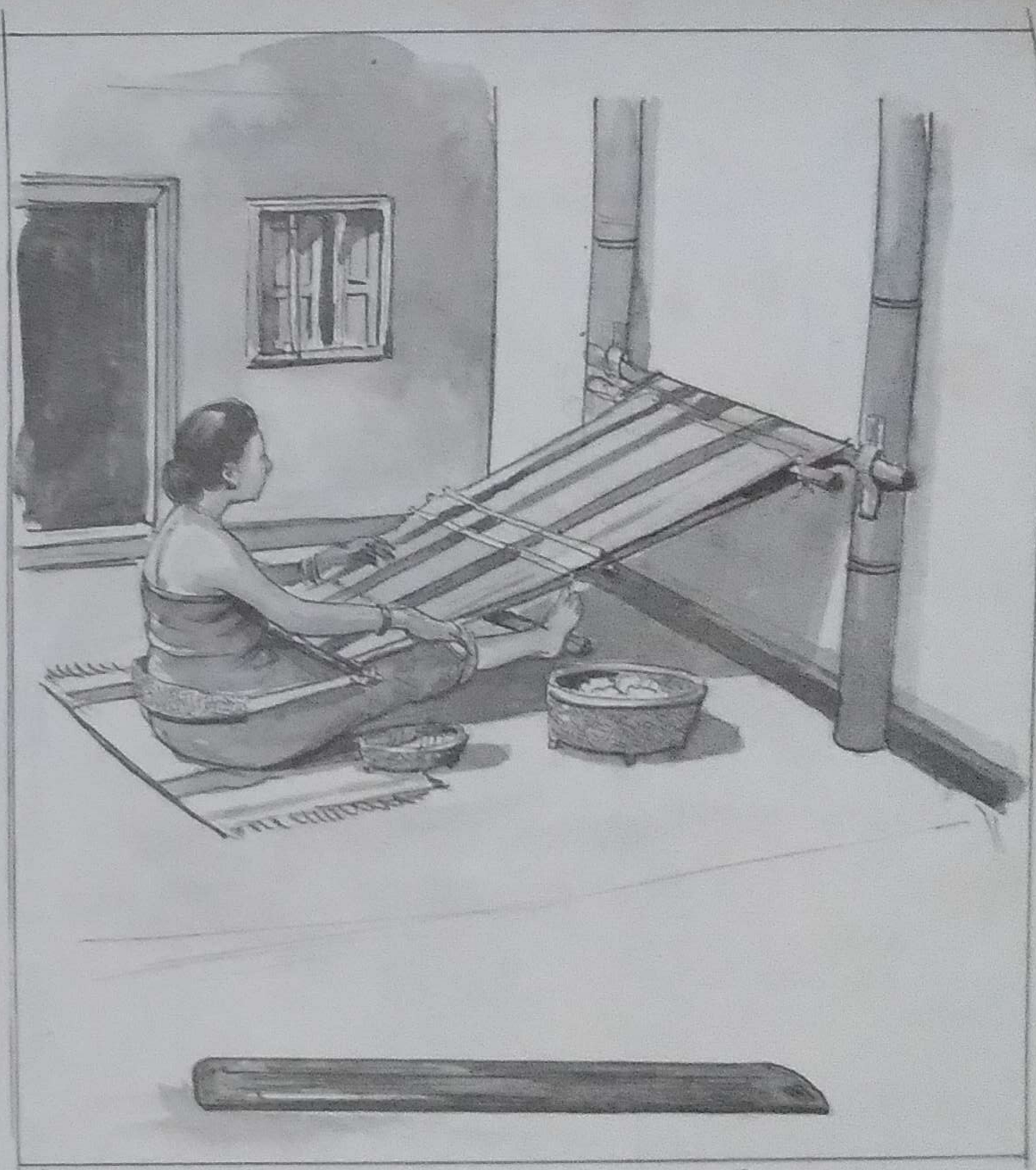

ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী হস্তচালিত তাঁত। উপত্যকা ও পাহাড়ের গ্রামগুলিতে প্রায় প্রত্যেক ঘরে যুবতী মেয়েরা এই তাঁত চালায়। কাবুই, তঙ্খুল, মিতেই, খাদৌ, ইত্যাদি কৌমের নিজস্ব ঐতিহ্যগত পোশাকের ধরন এবং নকশা অনুযায়ী আলাদা আলাদা কাজ এই তাঁতে করা হয়। তাঁতের সুতো টানা হয় একটা কাষ্ঠ-দণ্ড দিয়ে, বলা হয় 'তেম'। এটি বহুকাল থেকে মণিপুরী সমাজের মহিলারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে এসেছেন।

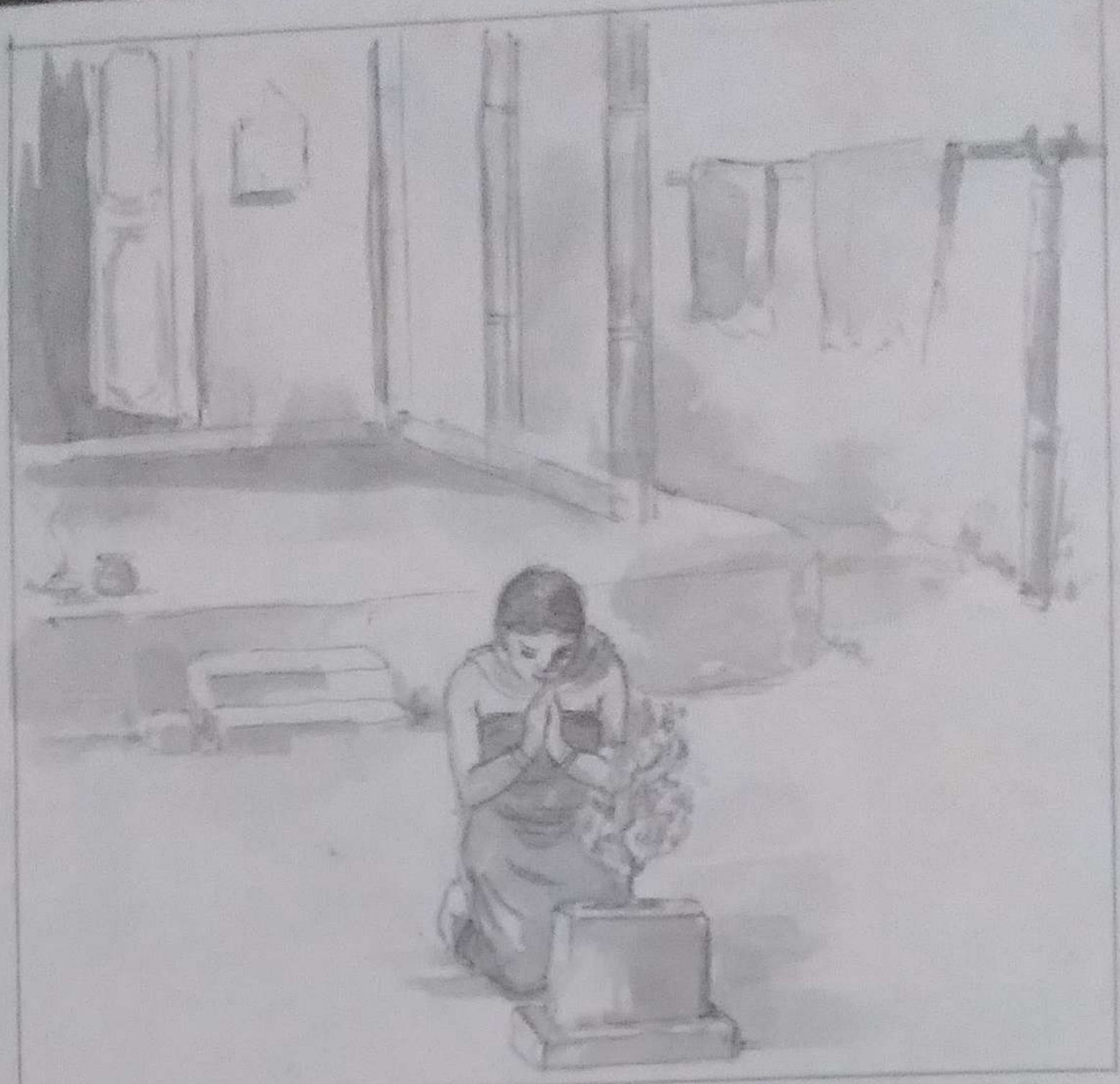

মণিপুরের বৈষ্ণব ঐতিহ্য। ঘরের আঙিনায় তুলসিতলায় সকাল সন্ধ্যে পিদিম জ্বালায় মণিপুরী হিন্দু মেয়েরা।

নিঙোল চাকৌবা : দেওয়ালীর পর বিশেষ দিনে ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে মেয়েদের রেঁধে খাওয়ানো হয়।

গ্রাম অথবা কৌম ভিত্তিতে দেবতাদের আনন্দ দান করবার লাই হারোবা উৎসব। উপত্যকার প্রায় চারশত গ্রামে এই মিতেই ঐতিহ্যগত উৎসব ব্যাপক আকারে আয়োজিত হয়।

কেইথেল। প্রাচীন কাল থেকে উপত্যকার মিতেই কৌমের পুরুষেরা যুদ্ধ করতে চলে যেত। গ্রাম-সমাজ ও পরিবারের দায়িত্ব বহন করতো মেয়েরা। তাদেরই নিজস্ব পরিচালিত বাজার কেইথেল।

'মেইরা পাইবি' সংগঠনের আগুয়ান মহিলারা অত্যাচারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কবল থেকে মণিপুরী সন্তানদের মুক্ত করছে।

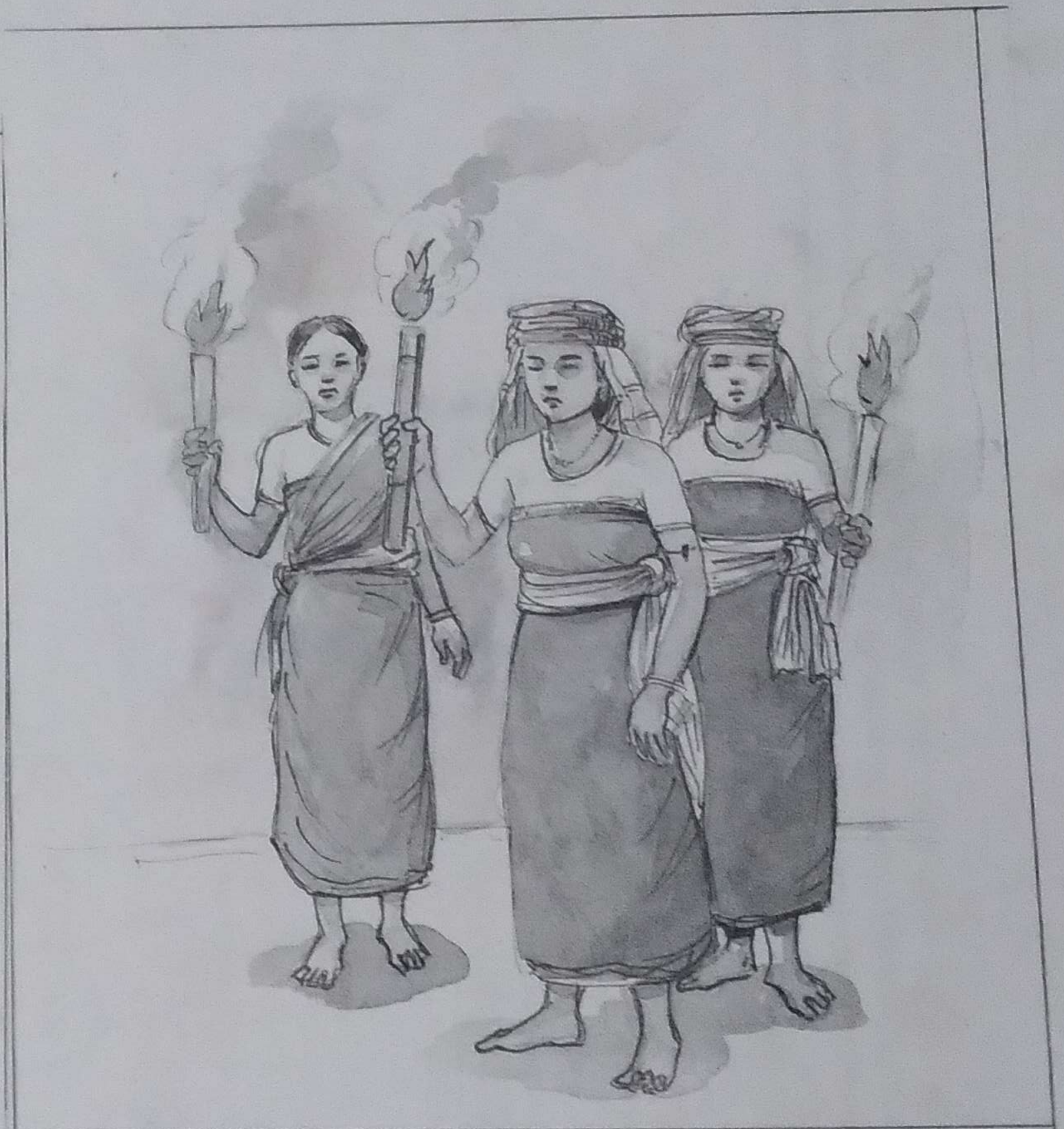

মেইরা পাইবি। ১৯৩৯ সালে হাজার-হাজার মহিলা মশাল ও তেম হাতে বৃটিশ ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধে শামিল হয়। সেই ঐতিহ্য বহন করছে ১৯৮০-র দশক থেকে সর্বত্র গড়ে ওঠা মেইরা পাইবি মহিলাদের স্থানীয় জোট।

মণিপুর : মানচিত্র

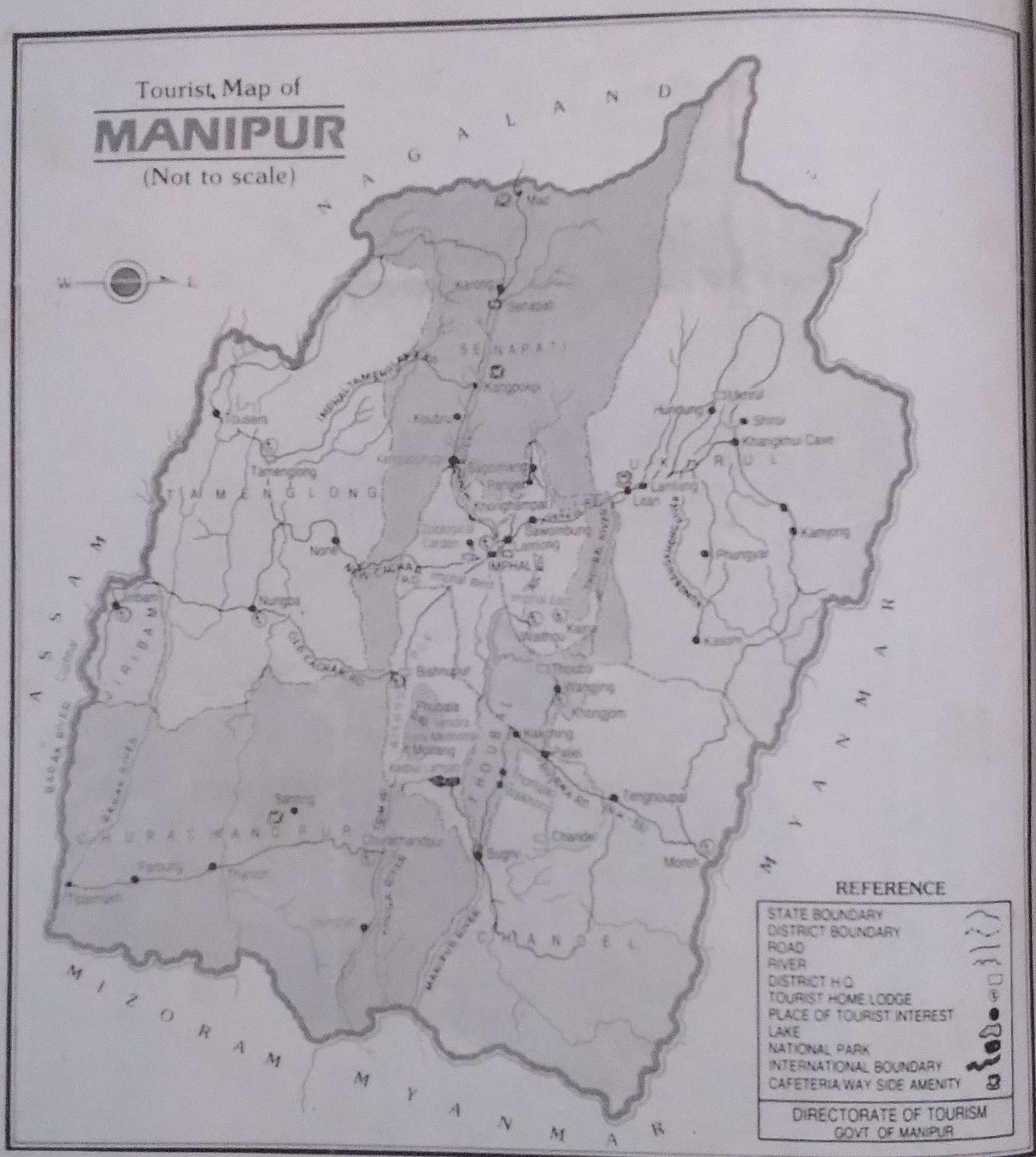

রাজধানী ইম্ফলের কেইথেলগুলি রয়েছে লামলঙ, তেরা, কোয়াকেইথেল, সিঙজামেই, কোঙবা-তে। আঞ্চলিক কেইথেলগুলি রয়েছে লিলঙ, উখরুল,সেনাপতি, মাও, তামেঙলঙ, জিরি, নাম্বোল, বিষ্ণুপুর, মোরাঙ, চুড়াচন্দ্রপুর, থৌবল, কাকচিঙ, সুগনু, মোরেহ্-তে।

আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। AFSPA প্রত্যাহারের দাবিতে অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মণিপুর (ATSUM) এবং অল নাগা স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, মণিপুর (ANSAM) পার্বত্য জেলাগুলিতে বারো ঘণ্টা বনধের ডাক দেয়। ইম্ফলের বহুস্থানে মশাল মিছিলের ওপর পুলিশ আক্রমণ করে। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের যৌথ আইন অমান্য আন্দোলনে উপাচার্য যোগ দেন।

কমিশন ঘোষণা করে, আসাম রাইফেল্‌স-এর তলবপ্রাপ্ত সেনারা উপস্থিত না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১১ আগস্ট ৬ জন MLA এবং দুজন মন্ত্রী ১৫ আগস্টের মধ্যে AFSPA প্রত্যাহার না করা হলে ১৬ আগস্ট বীর টিকেন্দ্রজিত পার্কে এসে পদত্যাগ ঘোষণা করবেন বলে জানান।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছয়টি গুপ্ত সংগঠন স্বাধীনতা দিবসের দিন সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেও মণিপুরের গণআন্দোলনকে এর আওতার বাইরে রাখার কথা ঘোষণা করে।

হাজার হাজার মানুষ মনোরমার বাড়ির দরজায় গিয়ে পুষ্পস্তবক দান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। এছাড়া কাবুই মাদার্স অ্যাসোসিয়েশনের দুই সহস্রাধিক সদস্য এরপরে মানবশৃঙ্খল গঠন করে।

১২ আগস্ট ৩১ মে ২০০৪ উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার মেয়াদ একবছর সম্প্রসারিত হয়েছিল। সেই নোটিফিকেশন সংশোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ইম্ফল মিউনিসিপাল এলাকার সাতটি বিধানসভা অংশ থেকে AFSPA আংশিকভাবে প্রত্যাহার করেন। মুখ্যমন্ত্রী ইরম শর্মিলার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অনশন প্রত্যাহার করতে বলেন। শর্মিলা AFSPA সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার দাবিতে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আপুনবা লুপও আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। জনসাধারণকে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটার মধ্যে মশাল মিছিল সংগঠিত করার আবেদন জানানো হয়।

১৩ আগস্ট রাজ্য প্রশাসন ১৮৯১ সালের শহীদ বীর টিকেন্দ্রজিত ও থঙ্গল জেনারেলের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে। হাজার হাজার মানুষও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হলে অন্যান্য এলাকা থেকেও AFSPA তুলে নেওয়া হবে এবং অবিলম্বে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হোক।

মেধা পাটকার মণিপুরীদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান।

১৪ আগস্ট সরকার রাজ্যে ISTV'র সংবাদ সম্প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আপুনবা লুপ ভারতীয় পণ্যবর্জনের ডাক দেয়।

১৫ আগস্ট বিষ্ণুপুরের বত্রিশ বছর বয়স্ক ছাত্র সংগঠক পেবম চিত্তরঞ্জন আগে থেকে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন। পরে RIMS-এ তাঁর মৃত্যু হয়। বহু এলাকায় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৬ আগস্ট আপুনবা লুপ পাঁচদিনের মধ্যে সমস্ত MLA-কে পদত্যাগ করবার দাবি জানায়। চিত্তরঞ্জনের দাহ না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

১৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সকলের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনার প্রস্তাব দেয়। মুখ্যমন্ত্রী চিত্তরঞ্জনের জন্মস্থান কোয়াকেইথেল তাখেল্লামবাম লেইকাই-তে ওঁর মৃতদেহ দাহ করবার অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি সৎকার-মিছিলের অনুমোদন করেন না।

৭ আগস্ট পুলিশের দমনপীড়নের ফলে আঘাত পেয়ে পরে মারা যায় ছাব্বিশ বছর বয়সী কোঙজেঙবাম মেমিতা। ওঁর মৃত্যুর প্রতিবাদ-মিছিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে, তিনজন আহত হয়।

১৮ আগস্ট নতুন করে আরও ষোল কম্পানী কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী মণিপুরে মোতায়েন করা হয়, নয় কোটি টাকার আন্দোলন দমন করার সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়।

দিনের বেলা আবার কার্ফু জারি করে সরকার নিজেই চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ দাহ করে। সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট চলতে থাকে।

আপুনবা লুপ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আপত্তিজনক বক্তব্যের নিন্দা করে। লুপের ১৭ জন নেতা এবং ২জন মহিলা নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০ আগস্ট আসাম রাইফেল্‌স গৌহাটি হাইকোর্টে আবেদন করলে বিচারক বি.কে.শর্মা কাঙলা দুর্গে আসাম রাইফেল্‌স কমাণ্ডেন্টের ক্যামেরা মারফত বিবৃতি নেওয়ার নির্দেশ দেয়। শুনানীতে তলব করা চারজন-এর উপস্থিতি সম্পর্কে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আপুনবা লুপ ২০ আগস্ট বেলা ১১টায় কোয়াকেইথেল তাখেল্লামবাম লেইকাই-তে চিত্তরঞ্জনের প্রতীকি সৎকার অনুষ্ঠানে সকলকে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানায় এবং সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে।

এগারজন মহিলাকে জাতীয় পতাকা পোড়ানোর জন্য জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (NSA) বন্দী করা হয়।

২১ আগস্ট চিত্তরঞ্জনের প্রতীক সৎকারে শোকগ্রস্ত জনতার সামনে মানবদেহের গন্ধযুক্ত 'পাঙগঙ' গাছ দাহ করা হয়। কাবুই মায়েরা ঐতিহ্যমণ্ডিত কাবুই প্রার্থনা উচ্চারণ করে। মিতেই শিল্পীরা বম্মম-নৃত্য প্রদর্শন করে।

মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবাসন থেকে পুলিশ AK-56 রাইফেল ও কার্তুজ উদ্ধার করার কথা জানালে উপাচার্য ও ছাত্র-ইউনিয়ন তা মিথ্যা বলে দাবি করে।

আসাম রাইফেল্‌স কর্তৃপক্ষ সাদার হিল্‌স অঞ্চলের গ্রামপ্রধানদের AFSPA-র পক্ষে মিছিল সংগঠিত করবার দাবি জানায়। মাত্র পঞ্চাশজন এতে অংশগ্রহণ করে।

২২ আগস্ট তিনটি ছাত্র সংগঠন AMSU, MSF এবং DESAM ২৫ আগস্ট থেকে পাঠ্যপুস্তক বয়কট করে ক্লাস বর্জন করার ডাক দেয়।

কয়েক হাজার মেইরা পাইবি, ছাত্র ও যুবকদের মিছিল শুরু হয় ওয়াবগাই হিয়াঙগ্লাম থেকে। ওকরাম ইবোবি সিং, শিবরাজ পাতিল ও প্রণব মুখার্জির কুশপুত্তল দাহ করা হয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাইরে প্রস্তুত ভারতীয় পানীয়ের বোতল পোড়ানো হয়। রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলি NSA-তে গ্রেপ্তারবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

সূত্র : **Imphal Free Press** সংবাদপত্রের সংখ্যাগুলি।

মনোরমার ধর্ষণ এবং ময়না-তদন্ত

১৯ আগষ্ট ২০০৪ Imphal Free Press দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত একজন স্টাফ রিপোর্টারের প্রতিবেদন "A post mortem of the genesis of a violent crisis" বঙ্গানুবাদ ক'রে প্রকাশ করা হল।

পুলিশী হেফাজতে বত্রিশ বছর বয়সী থাংজাম মনোরমা— আগে যিনি পিএলএ সংগঠনের সদস্য ছিলেন এবং যাঁকে এখনও সেনাবাহিনী ওই নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় কর্মী বলে অভিযুক্ত করেছে— সম্ভবত ধর্ষিত হওয়ার পর খুন হওয়ার ফলে এক বিক্ষোভের দাবানল জ্বলে ওঠে। মণিপুর রাজ্য জুড়ে রাস্তার সেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এখন ক্লান্ত হলেও স্তিমিত আকারে সংঘটিত হয়ে চলেছে। কিন্তু যে ঘটনার স্ফুলিঙ্গ থেকে এই দাবানল, তা কিছুটা পিছনে সরে গেছে।

এখন আন্দোলনের বর্শামুখ প্রায় সবটাই সাড়ে চার দশকের পুরনো সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন রদ করার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এখন যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা আর ততটা মনোযোগ পাচ্ছে না, তা হল, মনোরমাকে কি হত্যা করার আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল?

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সি. উপেন্দ্রর নেতৃত্বে একটি বিচারবিভাগীয় কমিশন বিষয়টা তদন্ত করে দেখছে। মনোরমার গ্রেপ্তারী এবং মৃত্যুর জন্য দায়ী আসাম রাইফেল্‌স ইউনিটটি কিন্তু কমিশনের সামনে হাজির হতে চাইছে না। তাদের আশঙ্কা পিএলএ নাকি তাদের আক্রমণ করতে পারে। অতএব তদন্ত প্রক্রিয়া থমকে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে তদন্তে প্রাপ্ত কিছু তথ্য অবধারিত সত্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। দু'-দুবার মহিলার মৃতদেহের ময়না-তদন্ত করা হয়েছে আলাদা দু'দল ডাক্তার দিয়ে। প্রথম ময়না-তদন্ত হয় ১১ জুলাই, যেদিন দেহটি প্রথম উদ্ধার করা হল। দ্বিতীয়বার হল জনসাধারণের দাবিতে ২৪ জুলাই। দুই পরীক্ষার রিপোর্টই তদন্ত কমিশনে পেশ করা হয়েছে।

তদন্ত চলাকালীন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ যে সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা হলো, মনোরমার দেহ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে কোনও রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। যে ডাক্তাররা ময়না-তদন্ত করেছেন এবং কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন : যে ধরনের ক্ষতচিহ্ন মনোরমার দেহে পাওয়া গেছে তাতে এক থেকে আধ লিটার রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কথা।

আসলে দুই ময়না-তদন্তেই পাওয়া গেছে, একাধিক গুলির আঘাতের ফলে 'আঘাত ও রক্তক্ষরণ'-ই মহিলার মৃত্যুর কারণ।

জনসাধারনের আন্দাজ, হয় ওঁকে হত্যা করার পর গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে, যখন ওঁর রক্তচাপ শূন্য হয়ে গিয়েছিল; আর নয়তো অন্য কোনও জায়গায় হত্যা করার পর ওঁর লাশ ওই জায়গায় এনে ফেলা হয়েছে। মনোরমা প্রস্রাব করার ছুতোয় পালিয়ে যাওয়ার সময় ওই জায়গাতেই নাকি ওঁকে গুলিবিদ্ধ করা হয়।

প্রথম আন্দাজটি সম্ভবত গণ্য হবে না। কারণ দুই ময়না-তদন্তেরই রিপোর্ট উপেন্দ্র কমিশন বিস্তারিত পরীক্ষা করে দেখে, মনোরমার দেহের ওপর গুলির ক্ষতচিহ্নগুলির প্রকৃতি বিশেষ ধরনের। প্রত্যেক ক্ষতেই গুলি ঢোকার জায়গায় লাল রিঙয়ের মতো দাগ (কলার) তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ গুলি ঢোকার সময় ক্ষতটির জায়গায় দেহগত প্রতিক্রিয়া ঘটছিল, যা মৃতদেহে সম্ভব নয়।

ওই দুই ময়না-তদন্ত রিপোর্টে ধর্ষণ সংক্রান্ত কী বলা হয়েছে? বাস্তবত সিদ্ধান্তকারী কোনও মন্তব্যই নেই। প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওঁর অন্তর্বাসগুলো এবং যোনিতে ব্যবহৃত শোষক পদার্থ "হিস্টোপ্যাথলজি এবং অন্যান্য পরীক্ষা"-র জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রথম ময়না-তদন্তের দু'সপ্তাহ পরে করা দ্বিতীয় ময়না-তদন্তে অবশ্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সরকার "হিস্টোপ্যাথলজি এবং অন্যান্য পরীক্ষা"-র অগ্রগতি সম্পর্কে একটাই তথ্য এপর্যন্ত পেশ করেছে। কলকাতার সরকারি গবেষণাগারে নমুনা পাঠানো হয়েছে।

যে কোনও পরিস্থিতিতেই সরকার ফলাফল প্রকাশ করতে চাইবে না। কারণ ধর্ষণের প্রশ্নে ইতিবাচক ফল অনিবার্য গণবিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে। আর নেতিবাচক ফল এলে, সরকারের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস এবং তাদের বর্তমান মনোভাব-এর কারণে কখনই সেই ফলকে সকলে সত্য বলে মেনে নেবে না।

আরও কিছু চমকপ্রদ তথ্য ময়না-তদন্তের রির্পোট দুটি থেকে বেরিয়ে আসছে। একটা হলো, অন্তত গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত মনোরমা ছিল অক্ষতযোনি, কুমারী। দ্বিতীয় ময়না-তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, মনোরমার সতীচ্ছদ ছিল আংশিকভাবে ছিন্ন। অর্থাৎ ওঁর সতীচ্ছদ অংশত আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে বলা যায়, হয়তো বা প্রচলিত অর্থে কোনও ধর্ষণ করা হয়নি। অতএব সতীচ্ছদ আংশিক ছিন্ন হওয়ার কারণ জানা যাবে না, কেননা একটা বুলেট ওঁর যোনিপথ ধরে জননেন্দ্রিয়ে ঢুকে গিয়েছিল।

প্রথম ময়না-তদন্ত পরীক্ষার রিপোর্টে মহিলার সারা শরীরে মোট বারোটা আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি বুলেটের আঘাত নয়। ওঁর পিঠের দিক থেকে ঢুকে যাওয়া বুলেটের আঘাতগুলো ছিল গড়ে ০.৬ সেমি ব্যাসের। বুলেটগুলো যেদিক থেকে বেরিয়েছে, সেখানকার আঘাতগুলো আরও চওড়া, এক থেকে তিন সেমি ব্যাসযুক্ত। নয়টির মধ্যে চারটি বুলেট ওঁর নিতম্ব এবং তার আশপাশ দিয়ে ঢুকে কুঁচকিতে ক্ষতসৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে একটা সরাসরি জননেন্দ্রিয়ে আঘাত করেছে, একটা লেগেছে উরুর ওপরদিকে। অর্থাৎ ওঁর শরীরের ওই বিশেষ অংশটাকে টার্গেট করা হয়েছিল।

অন্য পাঁচটা বুলেট আঘাত করেছে ওঁর বুক এবং উদরের উপরের দিকে। কোনও বুলেটই পায়ে লাগেনি। অর্থাৎ, যদি মনোরমার পালানোর গল্প বিশ্বাস করা হয়, তাহলেও ওঁকে থামানোর কোনও চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বুলেটের ছাড়া অন্যান্য তিনটি আঘাত লাল প্রহারের দাগ, প্রায় তিন সেমি ব্যাসের, দুটো হাতে কব্জির চার সেমি ওপরে, আর ডান পায়ের গোড়ালির চব্বিশ সেমি ওপরে।

প্রথম ময়না-তদন্তে মৃতদেহ পাঠানোর আগে শরীরে যে পোশাক পাওয়া গেছে তার বৃত্তান্তও চমকপ্রদ। শর্টহ্যান্ডে লেখা নোটের শেষ লাইনে বলা হয়েছে "ব্রেসিয়ার ছাড়া সমস্ত পোশাকই রক্ত এবং ধুলোয় মাখা ছিল এবং তাতে ছিল অনেকগুলি গর্ত।"

ময়না-তদন্তের ওই রির্পোটে দেখা গেছে, যে পাঁচটা বুলেট বুক এবং উদরের ওপরদিকে পিছন থেকে আঘাত করেছে, তার একটা বুলেট বেরিয়েছে ডানদিকের স্তনের কাছ থেকে, যার আঘাত-চিহ্ন ০.৮ থেকে ০.৯ সেমি চওড়া। মনোরমাকে যখন গুলি করা হয়েছিল, তখন কি ওর ব্রেসিয়ার পরা ছিল না?

১১ জুলাই সকালে যখন ঙারিয়ান পর্বতমালার ওপর ইয়াইফারোক মারিঙ গ্রামের কাছে ওঁর দেহ উদ্ধার করা হলো, তখন ওঁর ব্রেসিয়ারে কোনও হুক ছিল না।

তাহলে কি মনোরমা ধর্ষিত হয়েছিল? প্রচলিত সংজ্ঞায় ধর্ষণের সিদ্ধান্তকারী প্রমাণ হলো ধর্ষিতার যোনিতে পুরুষের বীর্যের উপস্থিতি। সেটা এখনও প্রমাণ হয়নি। কিন্তু যদি ধর্ষণ মানে হয় যে কোনও মহিলার জননেন্দ্রিয় টার্গেট করে তাঁর প্রতি অপমানকর ব্যবহার করা, যা নিপীড়নেরই একটা উপায়, তাহলে বহু তথ্যপ্রমাণ দিয়েই বলা যাবে সেটা অবশ্যই ঘটেছে।

আপুনবা লুপ-এর প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ

২০ সেপ্টেম্বর ২০০৪ মণিপুরের আপুনবা লুপ-এর মুখপাত্র লেইতানথেম উমাকান্ত মিতেই (উ. মি.)-এর একটি সাক্ষাৎকার নেন মন্থন সাময়িকীর সম্পাদক (ম.স.)। উমাকান্ত মিতেই পেশায় আইনজীবী এবং থ্রেটেন্ড ইন্ডিজেনাস পিপল্‌স সোসাইটি (TIPS)-এর সাধারণ সম্পাদক। সেই সময় তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। TIPS আপুনবা লুপ-এর একটি সদস্য সংগঠন।

ম. স. আপুনবা লুপ কবে তৈরি হল?

উ. মি. ১১ জুলাই মনোরমা হত্যার পর গঠিত হয়েছে।

ম. স. আপুনবা লুপ কথার অর্থ কী?

উ. মি. সমস্ত আন্দোলনকারী সংগঠনের একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ। আমাদের কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যদি আমরা যাই, তাহলে তারা একটা রাজনৈতিক সুযোগ নেবে। সমস্ত অ-মুনাফাভিত্তিক স্বেচ্ছা সংগঠন, যেমন, TIPS, COHR, HRA, HRCON-এর মতো মানবাধিকার সংগঠন এবং DESAM, AMSU, MSF-এর মতো ছাত্র সংগঠন আপুনবা লুপের মধ্যে রয়েছে। SFI, PSU, AISF-এর মতো ছাত্র সংগঠন অবশ্য এতে নেই। এগুলো রাজনৈতিক দলের ছাত্র-শাখা হিশেবে কাজ করে।

ম. স. এদের বর্তমান আন্দোলনে কীরকম ভূমিকা?

উ. মি. মণিপুরী সমাজের সমস্যা নিয়ে এদের স্পষ্ট কোনও লক্ষ্য নেই।

ম. স. মহিলারা আপুনবা লুপে কীভাবে রয়েছেন?

উ. মি. বেশ কিছু মহিলা সংগঠন এতে রয়েছে। যেমন, মেইরা পাইবি লুপ-এর কথা বলা যেতে পারে। আশির দশকের গোড়ায় এই সংগঠনের জন্ম হয়।

ম. স. তার মানে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA) যখন থেকে বলবৎ হল—

উ. মি. আসলে AFSPA মণিপুরে লাগু হয়েছে ১৯৬১ সালে। তখন মাত্র একটা জেলা, তামেঙলঙ-এ—

ম. স. হঠাৎ কী এমন ঘটেছিল, AFSPA জারি হয়ে গেল?

উ. মি. আপনি AFSPA-এর উৎপত্তিটা একটু দেখুন। প্রথমে বৃটিশ শাসকেরা একটা অর্ডিন্যান্স আকারে এটা নিয়ে আসে। বৃটিশরা আর্মি ক্যাপটেনদের একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়েছিল। এটা আদতে একটা ঔপনিবেশিক আইন।

ভারতীয় জনগণ এবং তাঁদের সংসদীয় প্রতিনিধি MP-রা POTA তুলে দিতে চলেছে। AFSPA কিন্তু POTA-র থেকেও কঠোর এবং নির্মম। ১৯৮০ সালে মণিপুরে AFSPA সার্বিকভাবে জারি হল। বহু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার জন্ম হল তখন থেকেই। বহু মানুষ নিখোঁজ হল, বহু মানুষ ভুয়ো সঙ্ঘর্ষে প্রাণ হারাল, বহু ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ...

ম. স. মেইরা পাইবিও কি এইসব ঘটনার জের ধরেই তৈরি হয়েছে?

উ. মি. আমাদের মেয়েরা এবং মায়েরা ভাবলেন, তাঁদের সন্তানদের কে এখন রক্ষা করবে? অতএব তাঁরা মেইরা পাইবি সংগঠন গড়লেন। গ্রামে, শহরে সর্বত্র এই মেইরা পাইবি লুপ গড়ে উঠেছে। আমাদের সমাজের অন্তঃস্থল থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে এটা এসেছে। প্রথমেই এর সংগঠকেরা ড্রাগ এবং অ্যালকোহল নিষিদ্ধ করলেন। তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর তথাকথিত নিরাপত্তা রক্ষার কবল থেকে নিজের সন্তানদের জীবনরক্ষার পথে নামলেন।

ম. স. 'মেইরা পাইবি' মহিলা সংগঠন কি মিতেই কৌমের মধ্যেই শুধু রয়েছে?

উ. মি. সমস্ত কৌমের মধ্য থেকেই এঁরা আসছেন। এমন কি বাঙালিদের মধ্যেও রয়েছে।

ম. স. আমরা অনেক সময় শুনতে পাই মণিপুরের পার্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চলের সমাজে কিছু বিরোধ রয়েছে—

উ. মি. এসব ভারত সরকারের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির প্রচার। ওদের ভুল নীতি।

ম. স. কিন্তু পার্লামেন্টে বা রাজ্য মন্ত্রীসভায় সমস্ত কৌমের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কি রয়েছে?

উ. মি. আমি ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। ওসব ইবোবি সরকার কংগ্রেস সরকার জবাব দেবে, ওদের ব্যাপার।

ম. স. কিন্তু আপনারাই তো ভোট দিয়ে ওদের পাঠিয়েছেন ক্ষমতায়।

উ. মি. মোটেই নয়। তাহলে আপনি আসল ব্যাপারটা জানুন। আমার কেন্দ্রে একজন এম.এল.এ. ছয় হাজার ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ভোটার রয়েছে পঁচিশ হাজার। বাকি উনিশ হাজার ওই এম.এল.এ.-র পক্ষে নেই। কীভাবে তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন? এটা তো সংখ্যা-রাজনীতির খেলা। ওই খেলার জোরে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি।

ক্ষমতায় যাওয়ার আগে অনেকেই AFSPA প্রত্যাহারের পক্ষে কথা বলেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার পর প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন। বিজেপি আজকে আপুনবা লুপের আন্দোলনকে সমর্থন করছে। অথচ AFSPA তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে বিজেপি-ই ছিল সবচেয়ে কট্টর। জর্জ ফার্নান্ডেজ ১৯৯৮ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থাকাকালীন বলেছিলেন, AFSPA রদ করা দরকার। আজ তাঁর বক্তব্য গোলমেলে। তিনি দ্বিচারিতা করছেন।

ম. স. সিপিআই এবং সিপিএম কী বলছে?

উ. মি. সিপিআই এখন মণিপুরের শাসক জোট SPF-এর মধ্যে রয়েছে। অথচ ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার আগে তাদের রাজনৈতিক ইশ্‌তেহারে বলেছিল, ক্ষমতায় এলে AFSPA রদ করার উদ্যোগ নেবে।

দুজন সিপিএম এমপি জুলাই মাসে মণিপুরে এসেছিলেন। ওঁরা মনোরমার বাড়িতে যান, হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই ... একমাত্র আরএসপি-র ভূমিকা কিছুটা আলাদা।

আসলে আমরা হলাম এযুগের জীবিত ডাইনোসোরাস। মণিপুরের মানুষ ডাইনোসোরাসের মতোই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ম. স. আপনি কি আপুনবা লুপের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের আলোচনা নিয়ে একটু বলবেন?

উ. মি. আলোচনার জন্য মণিপুর সরকারের চিঠি আমরা পাই ৩ সেপ্টেম্বর। আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তারা নির্দেশ দিল যাতে আপুনবা লুপের কোনও নেতা বা সদস্যকে গ্রেপ্তার না করা হয়। ইতিমধ্যে ৪ সেপ্টেম্বর MAFYF-এর সভাপতি এবং AMSU-র সাধারণ সম্পাদক-কে গ্রেপ্তার করা হল। এই দুই সংগঠন আপুনবা লুপ-এর মধ্যে রয়েছে। এদিকে আলোচনার দিন ধার্য হয়েছিল ৫ সেপ্টেম্বর। ভারত সরকার কী জন্য আলোচনায় বসতে চাইছিল? খুবই দুঃখজনক দুই সরকারের এই ব্যবহার। ভাগ্যক্রমে কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে MAFYF সভাপতিকে ৫ তারিখ রাত সওয়া আটটায় ছেড়ে দেওয়া হলো। আর ওইদিনই দুপুর সাড়ে বারোটায় ছিল শিবরাজ পাতিলের সঙ্গে আলোচনা। কী কারণে আলোচনায় ডাকা? যাই হোক, মণিপুরী জনসাধারণের মানসিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমরা খুবই ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করলাম। রাত সাড়ে নয়টায় আমরা আলোচনায় গেলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে শিবরাজ পাতিলের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমি ওঁর হাতে ১৯৬৪ সাল থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত একটা তালিকা দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দাবিগুলো কী? আমরা বললাম, আমাদের একটাই দাবি। মণিপুর থেকে AFSPA প্রত্যাহার করতে হবে। আপনারা জাতীয় সংহতির কথা বলছেন। ভাল কথা, কিন্তু মণিপুরের মানুষের নিরাপত্তা ছাড়া ভারতের সংহতি কীভাবে হতে পারে? আমরা কি ভুল বলছি? আমরা এখানে মৃত্যুর দিন গুনছি। আপনারা বলছেন আমরা সকলে এক। তাহলে তো আপনারই লোককে হত্যা করে আপনি এখানে রাজত্ব চালাচ্ছেন।

শিবরাজ পাতিল মহাশয় আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের আর কোনও দাবি নেই? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, ভারতীয় সেনারা আপনাদের জীবন রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছে। সে কী? কিন্তু আমরা তো দেখছি আমাদের জীবনরক্ষার দায়িত্ব পালন না করে ওরা এখানে এসে আমাদের ভাইদের হত্যা করছে, বোনেদের ধর্ষণ করছে, যা খুশি তাই করছে বিনা দ্বিধায়—

তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে আপনারা কি মণিপুর থেকে ভারতীয় সেনা তুলে নিতে বলছেন? আমি উত্তর দিলাম, একেবারেই তা নয়। আমরা কখনই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মণিপুর থেকে তুলে নেবার অনুরোধ করব না। ভারতীয় সেনারা মণিপুরের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন না করে ওরা যা খুশি তাই করছে। পাতিল সাহেব বললেন, AFSPA বলবৎ হবার পর মণিপুরে কতজনের জীবনহানি হয়েছে? আপনাদের জীবনহানির সংখ্যাটা রাশিয়ার থেকে ঢের কম। এমন কী পাঞ্জাব, কাশ্মীর বা আসামের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। আমি বললাম, আমরা এখন রাশিয়া, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসামের সমস্যা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন নয়। আমরা মণিপুরের সমস্যা নিয়ে আপাতত কথা বলতে চাইছি।

ভাবুন, কী ধরণের হাস্যকর ওঁর মনোভাব—

ম. স. খুব নৃশংসও বটে।

উ. মি. আসলে একজন দায়িত্বশীল অভিভাবকের অনুভূতি ওঁর ছিল না। তিনি মণিপুরে কেবল একটা পরিদর্শন করতেই যেন আসছেন, মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। আরএসপি, সিপিআই, সিপিএম এম.পি.-রাও এখানে এসে তিনচারদিন থেকে গেছেন। মণিপুরের সমস্যা নিয়ে কংগ্রেসের কোনরকম গঠনমূলক মনোভাব নেই। কেবল দমনমূলক পদক্ষেপের কথাই ওরা ভাবছে।

ম. স. বিজেপির জোটি সরকারও তো একই মনোভাব দেখিয়েছিল—

উ. মি. বিজেপি এবং কংগ্রেস হল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একবার ভেবে দেখুন, ওরা কতজন মারা গেছে সংখ্যার হিসেব করছে। অথচ আমাদের জনসংখ্যার অনুপাত কত? একটা ছোট্ট রাজ্য। তাহলে তো তিনি গণহত্যার দিক থেকে বিষয়টা দেখছেন। কথাটা খুবই চাঁছাছোলাভাবে তিনি পেড়েছেন। কীভাবে নিরাপত্তা রক্ষীদের তিনি মণিপুরীদের ওপর লেলিয়ে দিতে চাইছেন?

ম. স. আচ্ছা ইনসার্জেন্ট বা জঙ্গিদের সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব কী?

উ. মি. আপুনবা লুপের সঙ্গে ইনসার্জেন্টদের কোনও সংস্রব নেই। আমরা অহিংসে উপায়ে আমাদের দাবি নিয়ে গণআন্দোলন করছি। মণিপুরী সমাজ একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী, অন্যদিকে ইনসার্জেন্টদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে।

ম. স. ১৫ জুলাইয়ের মায়েদের বিক্ষোভ কি পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল?

উ. মি. না, এটা ছিল স্বতস্ফূর্ত। নিজের মেয়েদের ধর্ষিত হতে দেখে কতক্ষণ তাঁরা সহ্য করবেন? সন্তানদের বুলেটবিদ্ধ হতে দেখে কতদিন চুপ থাকবেন?

ম. স. ওঁদের নাম ও পরিচয় জানতে ইচ্ছা করে—

উ. মি. পরিচয়? মায়েদের নগ্ন প্রতিবাদের ধরনটা তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতীক পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ম. স. আচ্ছা, ভুয়ো সঙ্ঘর্ষ, নিখোঁজ হওয়া বা ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো কি তাৎক্ষণিক না আগে থেকে পরিকল্পিত?

উ. মি. পরিকল্পিত মনে করার মতো কারণ রয়েছে। ১৯৭৪ সালে মেজর নেগি-র নেতৃত্বে একদল BSF জওয়ান রোজ নামক এক মহিলাকে পরপর ধর্ষণ করে। কোনও শাস্তি তো হলই না, বরং পরবর্তীকালে IGP পদে নেগি-র পদোন্নতি ঘটানো হল। তাহলে একটা সন্দেহ তো থাকেই—

ম. স. তদন্ত কমিশনগুলো সম্পর্কে—

উ. মি. কমিশন তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়, কিন্তু কোনও রায় দিতে পারে না। যখন কোনও ঘটনা ঘটে, জনসাধারণের মনোভাব বুঝে তাদের শান্ত করার জন্য সরকার কমিশন নিয়োগ করে। AFSPA'র ৬নং ধারা অনুযায়ী দোষীরাই ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়, বিচারক হয়, আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার পায়। তাহলে এই আইনের মধ্যে আমাদের উপযুক্ত বিচার পাবার সুযোগ কোথায়? একই ব্যক্তির নানান মুখ, নানান চরিত্রে অভিনয়—

ম. স. কিন্তু শুনেছি আনজাওবি দেবী হত্যায় দোষী ব্যক্তির কোর্ট মার্শাল

হয়েছে।

হ. মি. এতে সরকারের কোনরকম ভূমিকা ছিল না। একজন ব্যতিক্রমী সৎ মেজর থাকায় ঘটনা ওইদিকে গেছে।

হ. স. শিবরাজ পাতিলের সঙ্গে আলোচনায় কোনরকম অর্থনৈতিক দাবির প্রসঙ্গ উঠেছিল কি?

হ. মি. না, আমরা কোনরকম ইকনমিক প্যাকেজ নিয়ে আগ্রহী নই। আমরা আজ মৃত্যুর দিন গুনছি। তিরিশ-চল্লিশ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ কি আমাদের জীবনের থেকে মূল্যবান? মণিপুরীদের হত্যা করার বিনিময়ে যদি টাটা এবং বিড়লা এক লক্ষ টাকা করে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেয়, আমাদের জীবনটা কি সেরকম বিনিময়যোগ্য? এরকম কোনও কথা কোনও পক্ষই তোলে নি।

হ. স. আপনারা কজন সেই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন?

উ. মি. সাতজন। আটজন থাকার কথা ছিল। একজনকে আটক করে রাখা হয়েছিল।

ম. স. মনোরমা হত্যার ঘটনার পরও কি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে?

উ. মি. হ্যাঁ চলছে। এমনকি AFSPA আংশিকভাবে তুলে নেওয়ার পরও গুলি করে একজনকে হত্যা করা হয়েছে AFSPA প্রত্যাহৃত অংশেই।

ম. স. আপনারা লুপ নেতৃত্বও কি অত্যাচারিত হচ্ছে?

উ. মি. আমি নিজেই হয়েছি। ৫ তারিখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। আর ৯ তারিখ আমাকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে বাজেভাবে মারধোর করা হয়। পূর্ব ইম্ফলের পোরোমপাত অঞ্চলে AFSPA তুলে নেওয়া হয়েছে। সেখানেই আমার বাড়ি। আর সেখান থেকেই কোনরকম অ্যারেস্ট মেমো, কোনরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। এটা কি সাংবিধানিক?

সাক্ষাৎকার

মনোরমা হত্যা এবং তদন্ত কমিশন

২৬ আগষ্ট ২০০৪, ইম্ফলে হিউম্যান রাইট্‌স ল নেটওয়ার্ক-এর কো-অর্ডিনেটর মেহেবাঙ রাকেশ এবং হিউম্যান রাইট্‌স অ্যালার্ট-এর প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ জয়কুমার ওয়াহেঙবাম আমাদের একটি ছোট্ট সাক্ষাৎকার দেন। সেটি বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করা হল। মেহেবাঙ রাকেশ মনোরমা-র ভাই থাঙজাম দোলেন্দ্র-র প্রতিনিধি হয়ে সরকারি কমিশনে অংশ নেন।

হ. স. মনোরমা হত্যার তদন্ত কমিশন সম্পর্কে জানতে চাই।

রাকেশ দশই জুলাই রাতে থাঙজাম মনোরমা দেবীকে তাঁর বামন কাম্পু মাখা লেইকাই-এর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে সতরতম আসাম রাইফেল্‌স ব্যাটালিয়নের সেনারা। ওঁর পরিবারের কাছে একটা অ্যারেস্ট মেমো দেওয়া হয়। মনোরমার কাছ থেকে অথবা ওঁর বাড়ি থেকে কোনও আপত্তিকর বস্তু পাওয়া যায় নি। এছাড়া মনোরমার বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেওয়া হয় এই মর্মে যে, তল্লাসী চালানোর পর কোনও কিছু ওই বাড়ি থেকে গায়েব হয়নি। পরদিন, ওঁর বাড়ির তিন কিমি দূরে ইম্ফল-ইয়াইফারোক সড়কের বিপরীত দিকে ইয়াইফারোক মারিং গ্রামের কাছে ওঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়।

জয়কুমার গ্রেপ্তার করার আগেই ওঁর মায়ের সামনে মনোরমাকে আসাম রাইফেল্‌স-এর লোকেরা মারধোর করে।

রাকেশ এরপর বামন কাম্পু মাখা লেইকাই-এর মানুষ ওইদিনই একটা পিপল্‌স অ্যাকশন কমিটি গড়ে তোলে। কয়েকটি সংগঠন মিলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা স্মারকলিপি দিয়ে দোষীদের শাস্তি এবং মণিপুর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার করার দাবি করে।

অতঃপর বারোই জুলাই মণিপুর সরকার মনোরমা হত্যা বিষয়ে তদন্তের জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সেশন তথা জেলা বিচারপতি সি. উপেন্দ্রকে নিয়োগ করা হয়। কমিশন ইম্ফলের স্যানজেনথঙ-এর রাজ্য সরকারি অতিথিশালায় তদন্তের কাজ শুরু করে। আসাম রাইফেল্‌স এবং অসামরিক নাগরিকদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীকে কমিশনে তলব করা হয়। নাগরিক এবং সরকারি সাক্ষীরা কমিশনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হলেও আসাম রাইফেল্‌স-এর সাক্ষীরা এখনও উপস্থিত হয়নি। বিপরীতে, আসাম রাইফেল্‌স-এর কমান্ডান্ট জগমোহন গৌহাটি হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে একটি রীট পিটিশন আবেদন জমা করেন। এর মধ্য দিয়ে মণিপুর সরকারের নির্দেশিত কমিশন গঠন এবং কমিশনের সাক্ষ্য তলব করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। ১৯ আগষ্ট বিচারপতি বি.কে.শর্মা এই আবেদনের ওপর একটি অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেন। কেবলমাত্র কমান্ডান্টকে কমিশন কাঙলা দুর্গে গিয়ে ক্যামেরার মাধ্যমে সাক্ষ্য নেবে। কিন্তু আসাম রাইফেল্‌স-এর তলব করা বাকি চারজন সম্পর্কে ওই আদেশে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। গতকাল অর্থাৎ ২৫ আগষ্ট সি.উপেন্দ্র জানান, ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে কমিশনের সামনে হাজির করা হবে। তাহলে বুঝতে পারছেন কী ঘটছে এখানে ...

ম. স. কিন্তু কলকাতার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে তো রিপোর্ট এসেছে—

রাকেশ হ্যাঁ, রিপোর্ট প্রথমে এসেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে। তার একটা কপি পুলিশ কর্তৃপক্ষ কমিশনে পেশ করেছে। ওতে দেখা যাচ্ছে, মনোরমার অন্তর্বাসে পুরুষের বীর্য পাওয়া গেছে।

জয়কুমার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ জয়সোয়াল ইম্ফলে এসে বলেছিলেন, আসাম রাইফেল্‌স কমিশনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। অথচ তারা সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে চলেছে। এটাই মণিপুরের বাস্তব চিত্র।

রাকেশ পিটিআই সংবাদমাধ্যমের একটা রিপোর্টে লেখা হয়েছে, প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন তারা নাকি কমিশনের কাছে তলব করা ব্যক্তিদের উপস্থিত করেছেন এবং কমিশনকে সহযোগিতা করছেন। কীভাবে এদেশের জনসাধারণকে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

ম. স. তাহলে কমিশনের নিয়তি কী হবে? আপনারা কিছু আশা করছেন?

রাকেশ কমিশন নিশ্চয়ই একটা রিপোর্ট তৈরি করবে এবং সরকারের কাছে তা পেশও হবে। কিন্তু এরকম কমিশন তো বহুবার গঠন হয়েছে।

ম. স. ১৯৮০ সালে AFSPA বলবৎ হবার পর কতগুলো কমিশন বসেছে?

জয়কুমার আমরা গুণতে পারব না, অনেক।

রাকেশ ১৯৯৫ সালে এগারজন মানুষকে হত্যা করার পর একটা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি.এম.সেন কমিশনের নেতৃত্ব দেন। একটা চমৎকার এবং স্পষ্ট তদন্ত রিপোর্ট তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আসাম রাইফেল্‌স-এর লোকেরা দোষী প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু কোনরকম শাস্তি বা প্রতিকার পাওয়া যায়নি।

ম. স. সরকার পদক্ষেপ না নেওয়ায় আদালতের কাছে যাওয়া হয়েছিল?

রাকেশ নিহতদের কোনও কোনও পরিবার থেকে থেকে গৌহাটি হাইকোর্টের ইম্ফল বেঞ্চে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হয়েছিল। কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অপরাধীদের সাজা হল না।

ম. স. ২০০১ সালে গণবিক্ষোভের সময় সিআরপিএফ জওয়ানরা যখন ১৮জন সাধারণ মানুষকে মেরে ফেলল, তখন কি কোনও তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছিল?

রাকেশ হ্যাঁ হয়েছিল। তখনও সি. উপেন্দ্র কমিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে ১৪৪ ধারা অথবা কার্ফু জারি করে দমন করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

জয়কুমার ১৯৮০'র দশকে সুপ্রীম কোর্টে একটা বিখ্যাত মামলা হয়েছিল—

রাকেশ হ্যাঁ, সেইসময় গোটা মণিপুর AFSPA-এর কবলে। ইম্ফল থেকে বহুদূরে উখরুল জেলার দুজন গ্রামবাসী নিখোঁজ হয়ে যান। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা দিল্লীর জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিয়াস কর্পাস রীট আবেদন করেন। সুপ্রীম কোর্টে একটা হেবিয়াস কর্পাস রীট আবেদন করেন। বিচারপতি ডি.এস.দেশাই তাঁর রায়ে ভারত সরকারকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্ত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া, সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে দিয়ে উখরুল জেলার এস.পি.র কাছে ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটা এফ.আই.আর. দাখিল করা হয়। স্বাধীনতার পর এইধরনের হেবিয়াস কর্পাস মামলার আর কোনও নজির নেই।

ম. স. কিন্তু নিখোঁজ ব্যক্তিরা কোথায় গেলেন? কী হল তাঁদের?

রাকেশ আমাদের মনে হয় নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁদের মেরে ফেলেছিল।

ম. স. এরকম নিখোঁজ করে দেওয়ার ঘটনা কতগুলো রয়েছে?

জয়কুমার নথিভুক্ত ঘটনা ১৮টি। অ-নথিভুক্ত আরও বহু ঘটনাই রয়েছে। গত পঁচিশ বছরে আসাম রাইফেল্‌স-এর অত্যাচারের ভয়ে বহু পরিবার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেয় নি। সেনার ভয় দেখায়, যদি তোমরা ঘটনা ফাঁস করে দাও, তোমাদেরও ভুগতে হবে।

ম. স. তাহলে আন্দোলনে সাধারণ মানুষ কীভাবে যাচ্ছে? ভয় পাচ্ছে না?

জয়কুমার আসলে মণিপুরী সমাজের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। মনোরমার ঘটনায় একটা অগ্ন্যুৎপাতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে আন্দোলন। এটা একটা বিশুদ্ধ গণআন্দোলন। এছাড়া আর কোনও রাস্তা মণিপুরীদের জন্য খোলা নেই।

মণিপুরী সমাজের কাছে পেবম চিত্তরঞ্জনের অন্তিম আবেদন

[সুইসাইড নোটের অংশ]

প্রথমে আমি আমার জন্মভূমি মায়ের কাছে নতজানু হই। ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলের আঘাতে জর্জরিত অক্রান্ত সন্তানহারা আমার মা, পর্বত ও উপত্যকার জননী আমার, আমাকে বলদান করো, যেন আমি হাসিমুখে আমার প্রিয় মাতৃভূমির আগামী প্রজন্মের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারি।

আজ তেরই আগষ্ট। এই ঐতিহাসিক দিনেই আমার পূর্বজরা পরাজয় অনিবার্য জেনেও অসম সাহসিকতায় বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আমরা তাঁদেরই সন্তান-সন্ততি, তাঁদেরই মহিমায় গর্বিত আজকের প্রজন্ম। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে এলাম, মণিপুরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার আগেই আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসল কালা কানুন। শুরু হল দমনপীড়নের দিন। পার্বত্য অঞ্চলের বহু ভাইবোনকে হত্যা করা হল। তবু শাসকদের আশ মিটল না। ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত উপত্যকাতেও চলছে একটানা হত্যা, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি। কালা কানুনের বলে অবিরাম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে জন্ম নিয়েছে মশালবাহিকা মহিলাদের জোট মেইরা পাইবি আর বহু মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন, যেমন, COHR, HRA, TIPS, ইত্যাদি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের জন্য এইসব সংগঠনের প্রয়াস আজও একের পর এক নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়ে চলেছে, যেমনটা হত ঔপনিবেশিক জমানায়।

কেবল এটুকুই নয়, জনসাধারণের চাপে মণিপুর সরকার মণিপুর রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করেছে। সেই কমিশনও কিছু নাটকীয় ভূমিকা প্রদর্শনের পর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

গত দোলযাত্রার সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ফলে তেরজন মানুষকে ভুয়ো সঙ্ঘর্ষে হত্যা করা হয়েছে, চরম দুর্দশার শিকার হয়েছে মানুষ। আজও সে-সন্ত্রাস চলছে। সাদার হিল্‌স এলাকায় যে ২, ৫ ও ৭ জন বিবাহিত মানুষকে পরপর হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের পিতৃহারা সন্তানেরা নানান অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। সম্প্রতি হত্যা করা হল পশুপালক জামবোলেট খোঙসাই এবং থাঙজাম মনোরমাকে। ধর্ষণ করার পরও মনোরমাকে রেহাই দেওয়া হল না। কারণ বেঁচে থাকলে তো সে গোটা দুনিয়ার কাছে জানিয়ে দেবে কী কাণ্ডটাই না ওর ওপর ঘটেছে।

দিল্লীর মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদের নেতৃবর্গকে গভীরভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। কিন্তু তার সময় অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। আর সেই নেতৃবর্গ আজ দয়াভিক্ষা করে প্রভুদের পা জড়িয়ে ধরে বসে রয়েছে।

আমার শেষ উচ্চারণ এটাই, বহু যন্ত্রণাক্লেশলব্ধ আমার মূল্যবান জীবনকে এক কালাকানুনের শিকার হতে দিতে আমি মোটেই চাই না। এই কালাকানুন এমনই, যা পৃথিবীর আর কোনও প্রান্তে এখন জারি নেই। আমি বরং নিজের হাতেই আমার এ-জীবন নির্বাপিত করে যাব। আমার উৎসর্গীকৃত জীবন মানব-মশাল হয়ে নক্ষত্রের মতো জনসাধারণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আমার সাথী কর্মীবন্ধুরা! আমার মা ও বোনেরা! আমার বন্ধু-বান্ধবী ও ছেলেবেলার সঙ্গীরা! তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলাম না বলে কিছু মনে কোর না।

সর্বশেষ, আমার পিতামাতাকে জানাই, তোমরা আমার এই মূল্যবান জীবনকে সৃষ্টি করেছ, আমায় লালন-পালন করে বড়ো করেছ। তোমাদের ঋণ এ-জন্মে আমি শোধ করতে পারলাম না। যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে, তবে স্বাধীন জন্মভূমিতে ফিরে এসে আমি সেই ঋণ মিটিয়ে দিয়ে যাব।

আমার দাদা-দিদি-বোন এবং আত্মীয়-পরিজনেরা। তোমরাও কিছু মনে কোর না। আমার বদলে তোমরা শত শত চিত্তরঞ্জনের দেখা পাবে।

মনোরমার অ্যারেস্ট মেমোর প্রতিলিপি

TRUE COPY

ARREST MEMO
ANNEXURE TO HOME DEPTT. GOVT. OF MANIPUR OFFICE MEMORANDUM
NO. 2/8/(86)/96-II Dtd. 5.6.97)

1.	Name of the arrestee and father Name or Husband's Name	**Th. Manorama Devi @Henthoi**
2.	Present Address	Bamon Kampu Mayai Leikai
3.	Permanent Home address	-do-
4.	Place of Arrest	-do-
5.	Date and Time of Arrest	11th July 04 03 30 hrs
6.	Reason of Arrest /Custody	Suspect of PLA
7.	Venue of Custody of Arestee	Bamon Kampu
8.	Property if any recoverd from the arestee and taken into charge at the time of arrest	Nill
9.	Health Consition and any bodily injury which may be apparant at the time of arrest	Healthy

10. Person to whom information about arrest was given - **Kamlei Devi (Mother)**

Signature

Sd/-
(of the arresting authority)
Name:- Suresh Kumar
No. 173355 Rank. Hav/GD
17 Asam Rifles
C/O 99APO

(a) Signature of Witness: No 173916 Rank Rfln. Name I. Lotha
(b) Signature of Witness: No 173491 Rank Rfln. Name Ajit Singh
(c) Counter Signature of the Arrestee with time and Date of Arrest

NO CLAIM CERTEFICATE

1. It is that Tps of Assam Rifles has apprehended Th. Monorama Devi from her house at 3.30A.M. on 11th July ,04 and searched the house in presence of family members and the undersigned don't have any claim against them.

2. It is further stated SF Personnel haven't mishehaved with the womenfolk or not damaged any property.

1. Th Kamlei Devi (Mother)
Sd/-
2. Th. Dolendro Meitei
Sd/-
Sd/-

মণিপুরে সামরিক বাহিনীর হাতে মানবিক অধিকার খর্ব হওয়ার চিত্র (১৯৮০-২০০৪)

১৯৫৮ সালে, ভারতবর্ষের গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে জারি হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন। তারই জের টেনে গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে যা চলছে তাকে 'মানবিক অধিকার খর্ব হওয়া' বললে প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় যে কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর সেই গ্রেপ্তার হওয়া মানুষটি নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, শুধু সন্দেহবশত গুলি করে হত্যা, যখন তখন বাড়িতে ঢুকে খানা-তল্লাসীর নামে ভাঙচুর, মারধোর, শারীরিক নিপীড়ন, মহিলাদের ধর্ষণ ও খুন—এসবই মণিপুরে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ভারতীয় সেনা-বাহিনী কর্তৃক এই অবর্ণনীয় অত্যাচারের একটা খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হল যাতে আঁচ পাওয়া যায় 'মানবিক অধিকার' মানে কী কী এবং তা কতটা মাত্রায় 'খর্ব' হচ্ছে।

১৯৮০ ২৬ এপ্রিল : লাংজিং গ্রামে খানাতল্লাসী চালানোর সময়ে ইরম ওংবি বিনোদেবী নাম্নী এক সন্তানসম্ভবা মহিলাকে সি. আর. পি. এফ. জওয়ানরা খুন করে।

সেপ্টেম্বর : মেনচাদেবীকে সি.আর.পি.এফ্ জওয়ানরা ধর্ষণ করে। ২৩ সেপ্টেম্বর, পূর্ব ইম্ফলের কাঙ্গুজাম লোকেন্দ্র সিং (২১), থকচম লোকেন্দ্র সিং (২১) ও কাঙ্গুজাম ইবরিমা সিংকে তাদের গ্রাম থেকে জে এণ্ড কে রাইফেলসের সেনারা ধরে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এদের মধ্যে শেষোক্তজন ফিরে এলেও বাকি দুজনের খোঁজ পাওয়া যায় নি।

২১ নভেম্বর : চিংপাহাড়ে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে চারজনের মৃত্যু হয়। হাওবাম মারাক সালাম লেইকাই, (ইম্ফল)-বাসী সালাম সমরেন্দ্র (২২), কোয়াকাইথেল লাইশ্রাম লেইকাই (ইম্ফল)-বাসী মুতুম গুণীন্দ্র (২২), মায়াং ইম্ফল বেনগানবাসী মহম্মদ ওয়াহিদ আলি ও খাংগাবকবাসী বাবু—এই চারজনই সাধারণ নাগরিক ছিলেন।

১৯৮১ **১লা মে**: ফুবালা গ্রামের মইরাংথেম ইংগোবি (২৮), বে মথং, মইরাংনিংথউ লেইরাক অধিবাসী ইংগুদাম মাংগি (৫৪) ও কোয়াকেইথেল মইরাংপুরেল (ইম্ফল)-এর অধিবাসী নামেই রাকপাম ইমো (২৩)—এই তিনজন নাটকের রিহার্সাল শেষে যখন ফিরছিল তখন মণিপুর রাইফেলস্ প্রথম ব্যাটেলিয়নের সেনারা এদেরকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

৯ জুলাই : আসাম রাইফেলসের একজন সিপাই হুইনিং গ্রামে আর.এস.মার্থা নাম্নী একটি বোবা-কালা মেয়েকে ধর্ষণ করে।

১৯৮২ **২২ জানুয়ারি** : ওকরাম চুথেকের হাওয়াইবাম কুমার এবং পাওনাম বসন্তকুমার নামক ডি.এম. কলেজের এক ছাত্র যখন টিউশন থেকে বাড়ি ফিরছিল তখন জে. এণ্ড কে. রাইফেলসের সেনারা তাদেরকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

পুখাওয়ের চন্দম চাওবা সিংকে সি.আর.পি.এফ. জওয়ানরা তুলে নিয়ে যায়। তাঁর কোনো খোঁজ না মেলায় তাঁর স্ত্রী নাংশিতোম্বি গুয়াহাটি হাইকোর্টে কেস করেন। কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও চাওবা সিংকে কোর্টে হাজির করতে না পারায় তাঁর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

১০ই মার্চ : সি ড্যানিয়েল আগে ছিলেন মণিপুর রাইফেলসের নাইক সুবেদার, পরে উরখুলে হুইনিং গ্রামের জুনিয়র হাইস্কুলের হেডমাস্টার হন ; আর.সি. পল ছিলেন ওই গ্রামেরই ব্যাপটিস্ট চার্চের সহ-যাজক—এই দুজনকেই ২১নং শিখ রেজিমেন্টের সেনারা ধরে নিয়ে যায় এবং ফুংগেরি ক্যাম্পে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটকে রাখে। এদের সঙ্গে পরিবারের কাউকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না। সুপ্রীম কোর্টে কেস হয়। কোর্টে এদেরকে উপস্থিত করতে না পারায় এদের প্রত্যেকের পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ধরে নেওয়া যায়—সামরিক হেফাজতে এদের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে।

১৯৮৩ **৫ জানুয়ারি** : জে. এণ্ড কে. রাইফেলসের সেনারা খাইজেম ব্রজলাল (২৯) নামক টপ মইরাং কাম্পু (ইম্ফল)-এর অধিবাসী একজন সরকারি কর্মচারিকে গুলি করে হত্যা করে।

৬ই নভেম্বর : পুংদোংবামের খাইদেম বুধা সিংকে মাঝরাতে সেনাবাহিনীর লোকেরা ধরে নিয়ে যায়। এরও কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। বুধা সিং অন্তর্ধান মামলার নিষ্পত্তি যথারীতি তার পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

১৯৮৪ **১৪ মার্চ** : হেইরাং থঙে প্রায় ৩০০০ দর্শক যখন একটা ভলিবল ম্যাচ দেখছিল তখন সি.আর.পি.এফ. জওয়ানরা এসে তাদের উপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। এর ফলে ১৩ জন ঘটনাস্থলে মারা যান ও আরো ৩০ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হন।

১৯৮৬ **২৪ জানুয়ারি** : উখরুলে নাইমা গ্রামের লুইংগামলাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেফটেনান্ট ধর্ষণ করে খুন করে।

২৩/২৪মে : তামেংলং জেলার তাউসেমে আসাম রাইফেলসের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ন টি.পি.ইঞ্জেলুং (৪০) ও আর.কে.সংহাউড্‌কে গুলি করে হত্যা করে এবং আরো অনেক কয়জনকে প্রচণ্ড মারধোর করে।

১৭ আগস্ট : এল.ওয়াই.পল (১২)-কে ডোগরা রেজিমেন্টের সেনারা হত্যা করে।

১৯৮৭ **১১ জুলাই** : ওইনাম গ্রামে আসাম রাইফেলসের ২১নং ব্যাটেলিয়ন ১৫জন সাধারণ নাগরিককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং অসংখ্য মানুষের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালায়। তারা তল্লাসী অভিযানের সময়ে গ্রামে ঢুকে বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ করে।

১৯৮৮ **৮ জুলাই** : উখরুল জেলার ওয়ানঘঙ গ্রামের আর.এস.ইসাককে, শিমতাংফারুঙের অধিবাসী জেড ভি. ক্যানান ও খারাংফুং-বাসী আর.কামির সাথে একসাথে গ্রেপ্তার করে আসাম রাইফেলসের ২০নং বাহিনী। পরের দিন পুলিশ এ. সি. ইসাউ নামক একজনের মৃতদেহর সাথে সাথে জেড্র ভি ক্যানানের মৃতদেহ খুঁজে পায়। আর. কামিকে গ্রেপ্তার করার পাঁচদিন বাদে ছেড়ে দিলেও ইসাকের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এই ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টে কেস করা হলে গুয়াহাটি হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে মৃত দুই ব্যক্তি

ও নিখোঁজ ব্যক্তির প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক্।

১৯৯২ **৩০ জুলাই** : থাউবাল জেলার কাকচিং খুনোন মায়াই লেইকাইয়ের অধিবাসী নাওরেম কৃষ্ণমোহন সিংকে একদল পুলিশ বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় কাকচিং পুলিশ স্টেশনে ধরে নিয়ে যায়। কয়েকঘণ্টা বাদে পুলিশরা কৃষ্ণমোহন সিং-য়ের বাড়ীতে গিয়ে জানায় যে কৃষ্ণমোহন পালিয়েছে এবং সে যেন পরের দিন সকালে থানায় গিয়ে দেখা করে। ২ আগস্ট কৃষ্ণমোহনের মৃতদেহ কাকচিং পুলিশ স্টেশন থেকে ৫ কি.মি. দূরে, থারংপাট নামক স্থানে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩০শে আগস্ট : লিলং হাওরেইবি চন্দাখণ্ড-অধিবাসী মহম্মদ হোসেন ওরফে নাসির খানকে একদল পুলিশ একইভাবে লিলং পুলিশ স্টেশনে তুলে নিয়ে যায়। এরপর তারা অভিযোগ করে যে নাসির খান থানা থেকে পালিয়েছে। ৩০ আগস্ট সন্ধ্যেবেলা আতাউখং নামক স্থানে ইম্ফল নদীতে নাসির খানের মৃতদেহ পাওয়া যায়, তখনও তার হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল।

১৯৯৩ **২৫ আগস্ট** : তেরা কেইথেলে সি.আর.পি.এফ. বাহিনী ৫ জন সাধারণ নাগরিককে নির্মমভাবে খুন করে এবং আরো বেশ কয়েকজনকে বেদম পেটায়।

২৮ অক্টোবর : থউবাল মোইজিং ওয়াংমা তাবার অধিবাসী মহম্মদ বরুণ ইসলামকে আসাম রাইফেলসের সপ্তম ব্যাটেলিয়ন হত্যা করে।

১৯৯৪ **১৮ ফেব্রুয়ারি** : থ.জউসো হিমার-কে ১৪নং গারওয়াল রেজিমেন্টের সেনারা গুলি করে মারে।

১৭ মার্চ : ইম্ফলে চিংগা পাহাড়ে অবস্থানরত আসাম রাইফেলসের গুলি চালানার ফলে মহম্মদ সাত্তার (৪৫) নামক একজন রিক্সাচালক মারা যান এবং আরো অনেকে আহত না।

৬ এপ্রিল : সি. আর. পি এফ্ ও মিলিটারী পুলিশের যৌথ দলের অত্যাচারে মুতুম প্রেমজিৎ (১৮) মারা যায়।

৯ এপ্রিল : উখরুলে আসাম রাইফেলসের ২০নং ব্যাটেলিয়নের দৌরাত্মে ৩ জন মারা যান ও ৭০ জন আহত হন। চারজন মেয়ে সহ বহু মানুষকে অন্যায় ভাবে আটক করা হয়।

৯ মে : উখরুল শহরে সোনাবাহিনীর অত্যাচারে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র কে.সোচিচান মারা যায়। একইদিনে মাথোতলা দেবীকে সেনারা গুলি করে মারে।

৬ জুলাই : ১২৭নং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স কে. নামজোকলাং-কে হত্যা করে।

২৮ জুলাই : আসাম রাইফেলসের ৩১নং বাহিনীর গুলিতে চারজন মারা যান এবং ৩জন গুরুতরভাবে আহত হন।

১২ আগস্ট : এস.কে.ইয়ারমি (২৭) নামক এক যুবককে আসাম রাইফেলসের ২৫নং ব্যাটেলিয়ন খুন করে।

১৭ সেপ্টেম্বর : উখরুল জেলায় সোমসাইতে, আসাম রাইফেল্স্-এর ২০ নং ব্যাটেলিয়নের রাইফেলম্যান এম. কাইজালাল পাইতে ছুটির পর কাজে যোগ দিতে দেরি করে। ফলে ২৫ সেপ্টেম্বর তাকে সেনাবাহিনীর ইউনিট-অ্যাম্বুলেন্সে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ নেই। যথাসময়ে তাকে কোর্টে হাজির করতে না পারায় ধরে নেওয়া হয়েছে যে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং কোর্টের নির্দেশে তাঁর মাকে আড়াই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর : ১৩নং শিখ লাইট ইনফ্যানট্রি ১২জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের উপর শারীরিক নিপীড়ন চালায়।

৩০ ডিসেম্বর : লেইমারাম গ্রামে সি.আর.পি.এফ.-এর ১১৯নং ব্যাটেলিয়ন নিংথাউজাম ইংগোচা (২৮)-কে হত্যা করে।

১৯৯৫ **৭ জানুয়ারি** : আর.আই.এম.এস. হাসপাতালের চত্বরে নয়জন সাধারণ নাগরিককে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে, তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে সি.আর.পি.এফের ৭৯নং ও ১১৯নং বাহিনীর জওয়ানরা।

১৯ ফেব্রুয়ারি : ইম্ফলের বাশিখণ্ডে সি. আর. পি. এফ–এর ১২৭নং ব্যাটেলিয়নের গুলি চালনায় তিনজন সাধারণ নাগরিক মারা যান এবং আরো বহুজন আহত হন।

২৮ এপ্রিল : চূড়াচাঁদপুর জেলার জাংখেঙ্ফাই গ্রামের (৫০)-কে সি.আর.পি.এফ. বাহিনীর লোকেরা প্রচণ্ড প্রহার করে এবং পরের দিন তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

৪ জুন : চাণ্ডেল জেলার কোমলাথাবি গ্রামের ছেলে এনজি তমপক (১৯) যখন কাম্বুখেল গ্রাম থেকে তার বাড়িতে ফিরছিল তখন ৬ষ্ঠ মাদ্রাজ রেজিমেন্টের এক ভ্রাম্যমান দল, রাস্তা থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তমপকের আর খোঁজ নেই।

১১ আগস্ট : উখরুল জেলার খোংজল গ্রামের এন.এস.জন (২৮) ছিলেন ৩১নং আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর রাইফেলম্যান। ১১ আগস্ট তামেংলং জেলার হেডকোয়ার্টার থেকে ফেরার পথে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান।

১৪ আগস্ট : খোংম্যান জোন ২-তে ভারতীয় বাহিনীর ২নং মহারেজিমেন্ট সোইবাম সঞ্জয় (১৮) নামক এক কারখানা পরিচালককে হত্যা করে।

১৯ সেপ্টেম্বর : পুংদংবামে সি.আর.পি.এফ-এর ১৩৩নং বাহিনী গুলি চালিয়ে স্কুল শিক্ষিকা ইরম ওংবি রোমা দেবীকে হত্যা করে এবং আরো অনেকে আহত হন।

১৯৯৬ **১১ মার্চ** : উখরুল জেলার হুইসু গ্রামে আসাম রাইফেলসের ২০নং ব্যাটেলিয়ন ২ জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে।

৫ এপ্রিল : ওইনাম মায়াই লেইকাইতে সি.আর.পি.এফ.-এর ১২৭ নং ব্যাটেলিয়ন ওইনাম ওংবি আমিনা দেবী (২৫)-কে নির্মমভাবে খুন করে।

৩ মে : কোয়াকেইথেলে, ক্ষেত্রিমায়ুম ওংবি প্রবাহিনী দেবী (৪৫) যখন তাঁর ঘরে কোলের মেয়ের সাথে ঘুমিয়েছিলেন তখন আসাম রাইফেলসের ৩০নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

২ জুন : থাংমেইবান্দ সিনাম লেইকাইয়ের অধিবাসী নেপ্রাম ওংবির যুবতী কন্যা কুঞ্জবতী দেবীকে, সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা

অগ্রাহ্য করে, গ্রেপ্তারের বিনিময়ে কোনো মেমো না দিয়ে, জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও ৩দিন আটকে রাখা হয়।

৫ জুন : ইম্ফল পশ্চিম জেলার থাংমেইবান্দ হিজাম লেইকাই-এর অধিবাসী লাইশ্রাম বিজয়কুমার সিং (৩৪)-কে রাত একটার সময় মিলিটারী উর্দিপরা হিন্দিভাষী কয়েকজন মানুষ তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকে তার আর কোনোরকম খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

৩ জুলাই : সাগাং-এ সি.আর.পি.এফ.-এর ২৩নং ব্যাটেলিয়নের গুলি চালনায় খুমান কম (৫৮) মারা যান এবং আরো অনেকে আহত হন।

৬ জুলাই : পাল্লেল-এ আসাম রাইফেলসের ২২নং ব্যাটেলিয়ন গুলি চালিয়ে নাংবাম সান্দিয়ারাণি (৩০)-কে মেরে ফেলে ; এই ঘটনায় আরো অনেকে আহত হন।

২৮ আগস্ট : সাগাং-এর ২৩ নং সি.আর.পি.এফ. বাহিনীর হাতে খুতিনলেই কম (৩০) খুন হন।

৩০ আগস্ট : কওয়াক্টায় মহম্মদ সোলেইমান (৩০) মারা যান সি.আর.পি.এফ.-এর ২৩নং ব্যাটেলিয়নের হাতে।

আগস্ট মাসেই "কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশন"-এর সময়ে সেনাবাহিনীর দুইজন এক মহিলাকে তাঁর ১২ বছরের ছেলের সামনে ধর্ষণ করে।

২৫ ডিসেম্বর : ওয়াবাগাইয়ের কেইরাক গ্রামবাসী থাউডাম মুনিন্দ্র (৪৮)-কে ইণ্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন হত্যা করে।

১৯৯৭ **২০ ফেব্রুয়ারি** : ওকরাম চুথেকের কাছাকাছি জায়গায় কাঙ্গুজাম ওজিত নামে এক যুবককে আসাম রাইফেলসের ৩০নং ব্যাটেলিয়ন গ্রেপ্তার করে। পরের দিন তাকে হত্যা করা হয় ও সংঘর্ষে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

১৭ জুলাই : উখরুল শহরে আসাম রাইফেলস্ গুলি চালিয়ে রামাসো নামের এক যুবককে হত্যা করে, এই দুঃসংবাদ শুনে রামাসোর বাবাও মারা যান।

১৯৯৭-এর আগস্টে তাকিয়েল খোংবামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই জওয়ান শ্রীমতী আহানজাওবি দেবীকে তাঁর ১২ বছর বয়স্ক মূক ও বধির ছেলের সামনে ধর্ষণ করে ; শুধু তাই নয়, ওই জওয়ানরা ওই অসহায় বালকটিকে তার মায়ের শ্লীলতাহানি দেখতে বাধ্য করে।

১৯৯৮ **১২ ফেব্রুয়ারি** : ইম্ফল পূর্ব জেলায় আংথা মায়াই লেইকাই অঞ্চলে ইউমলেমবাম সানামাচা সিং (১৪) যখন বাড়িতে বসে তার পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল তখন ১৭নং রাজপুতানা রাইফেলের সেনারা এসে তাকে ধরে নিয়ে যায় ; সঙ্গে তারা ইনাও এবং বিমল নামের আরো দুই বালককেও গ্রেপ্তার করে। পরের দিন ইনাও এবং বিমলকে ইয়াইরিপক থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সানামাচা সিং সেই তখন থেকে আজও নিখোঁজ।

৪ এপ্রিল : ষষ্ঠ জে.এণ্ডকে. রাইফেলসের টহলদার বাহিনীর একজন সৈন্য সন্তানসম্ভবা প্রামোদেবী (২৭)-এর ঘরে ঢুকে বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করে। মিলিটারী কোর্ট থেকে জানানো হয় এটা ধর্ষণের ঘটনা মোটেই নয়, সামান্য শ্লীলতাহানি মাত্র।

২৪ সেপ্টেম্বর : মণিপুর পশ্চিম জেলার কোয়াকাইথেল আয়াম লেইকাইয়ের অধিবাসী খুন্দ্রাকপাম বোয়াই ওরফে ইয়াইমা সিং (২০)-কে রাত্রিবেলা ধরে নিয়ে যায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩১৭নং ফিল্ড রেজিমেন্ট। একইসাথে গ্রেপ্তার হন জিরিবামের কদমতলাবাসী মোইরাং-থেম চার্চিল সিং। শেষোক্তজন পনের দিন ছাড়া পেলেও বোয়াই-এর কোনো হদিশ মিলছে না। সেনাবাহিনী বলছে তারা নাকি বোয়াইকে গ্রেপ্তারই করেনি।

১৯৯৯ **১৪ জানুয়ারি** : ইম্ফল পূর্বে পুখাও আহালাপ আওয়াং লেইকাই অঞ্চলের অধিবাসী দুইবোন লাইশ্রাম বিমলা (৩২) ও লাইশ্রাম মনিসাং (২৯)-কে বিদ্রোহীদের গোপনে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে, সি. আর. পি. এফ্ বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এদেরকে পাঙ্গেই ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে উলঙ্গ করে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। তারপর সন্দেহজনক কিছু খুঁজে না পাওয়ায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অত্যাচারের ফলে দুই বোনকে দুই সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি : বিষেণপুর জেলায় খইজ্জমান গ্রামে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত এক বিশাল সামরিকবাহিনী ঢুকে মেইরা পাইবিদের ধরে ভীষণ মারধোর করে। (মেইরা পাইবি হচ্ছেন মণিপুরের সেইসব বয়স্কা ও অতি-সম্মানিত মহিলা যাঁরা সামাজিক আন্দোলনের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন।) এর ফলে লাইশ্রাম মাণিমাচা (৬০). থিয়াম চাওবি (৭০), নাওরেম ইয়াইমা (৭০), থিয়াম গম্ভিনী (৭০), চিংসুবাম মেমচা (৪০), থাংজাম মইথাপ (২৫), ওয়াহেংবাম মেমচা (২৫) এবং সৈবাম সুমিতা (২৫) সাংঘাতিকভাবে আহত হন। তাঁদের দোষ, তাঁরা বুধি সিং নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে আসা সৈন্যদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার ঠিক দু'সপ্তাহবাদে : খইজ্জমান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে তৌবুলে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৩২নং বাহিনী মেইরা পাইবিদের উপর গুলি চালায় ; এর ফলে আহত হন থিয়াম মাঙ্গিলেইমা (৪০), থিয়াম ইবেমা (২৪) ও সৈবাম সোমিবালা (২৪)।

২৫ জুলাই : ইম্ফল পূর্বে কাইরাং মুসলিম গ্রামের মহম্মদ তায়েব আলিকে ১৭নং আসাম রাইফেলসের সেনারা সাঙ্গাকপামের পাওমেই কলোনী থেকে একটা মারুতি ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যায়। এরপর যথারীতি তায়েব আলি গায়েব হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয় তায়েব আলি সংঘর্ষে মারা গেছে ; অথচ আসাম রাইফেলস তায়েব আলিকে গ্রেপ্তার করেনি বলে জানায়। এই ঘটনা নিয়ে মামলা চলছে।

২০০০ **২ নভেম্বর** : 'মালোম ম্যাসাকার'-এ ১১জন সাধারণ নাগরিক ইম্ফল বিমাবন্দরের কাছে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন। এর প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন চালাচ্ছেন ইরম শর্মিলা (৩২)। সরকারি হাসপাতালে এখনও গেলে দেখা যাবে

এই যুবতীর নাকে নল ঢুকিয়ে তাকে জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে।

২০০১ সুগুনুতে সি.আর.পিএফ. বাহিনী গুলি চালিয়ে ১২ জনেরও বেশি সাধারণ নাগরিককে মেরে ফেলে। এই ঘটনাকে মণিপুরের মাই-লাই বলা হয়। ভিয়েৎনামের মাই-লাইতে আমেরিকার সৈন্যরা এরকমই গণহত্যা ঘটিয়েছিল।

২০০২ **১০ জানুয়ারি :** ইম্ফল পশ্চিম জেলার টেরা আমুডন আখাম লেইকাইবাসী ক্ষেত্রিমায়ুম খাম্বাতোন ওরফে ধীরেন (২৬)-কে ভোর ৪.৩০-এ বি.এস.এফ, আই.আর.বি. ও সিভিল পুলিশের যুক্ত বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ নেই।

৫ এপ্রিল : সিংজামেইয়ের নাওরেম লেইকাইবাসী থিঙ্গুজাম মাইকেলকে সেনাবাহিনী গুলি করে মারে। সরকার এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করলে সেনাবাহিনী সেই তদন্ত বন্ধ করে দেয়।

২০০৩ **৪ অক্টোবর :** জিরিবামের প্রত্যন্ত গ্রামের কুমারীযুবতী এন সঞ্জিতাকে ১২নং গ্রেনেডিয়ার বাহিনী গণধর্ষণ করলে সঞ্জিতা আত্মহত্যা করে।

২০০৪ **২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ :** এই সময়ের মধ্যে ১৩ জন যুবককে 'ভুয়া সংঘর্ষে'র অজুহাতে সেনাবাহিনী গুলি করে মারে।

৩ এপ্রিল : কাকচিং থানার অন্তর্গত কেইরাক গ্রামের ৩ যুবককে আসাম রাইফেলসের সেনারা এমন মার মারে যে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

৬ এপ্রিল : চূড়াচাঁদপুরে পুরনো বাজার এলাকায় সি.আর.পি.এফ. জওয়ানরা এলোপাথাড়ি গুলি চালালে একজন মহিলা আহত হন।

২৮ এপ্রিল : ওকসু মামাং লেইকাইয়ের অধিবাসী লুকরাম সুনীল ওরফে ইবোমচাকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেইদিনই তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

৪ মে : বিষ্ণুপুর জেলার লেইমাপোকপাম খুনফাম মাখা লেইকাইয়ের মেঘচন্দ্র ওরফে রমেশকে গ্রেপ্তার করা হয় তার বাড়ি থেকে এবং সন্ধেবেলা তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

৬ মে : লামলাই থানার অন্তর্গত নগদাম ক্যাম্পে আসাম রাইফেলস্ বাহিনী ৫ জন গ্রামবাসীর উপর এমন অত্যাচার চালায় যে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

১১ মে : খোয়াথং পোল্লেম লেইকাইয়ের হঞ্জবম ববি শর্মাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আসাম রাইফেলস বাহিনী অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে ইম্ফল শহরের কাংলা মোটে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

২০ মে : ইম্ফল পশ্চিম জেলার লামসাং থানার অন্তর্গত মায়াং লাং জিঙে দুই যুবককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

২৫ মে : সেনাপতি জেলার কাংপোকপি অঞ্চলের দুই যুবককে আসাম রাইফেলস্ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়।

৩০ মে : মণিপুরের খাদ্য ও পৌর সরবরাহ মন্ত্রী ফেইরোইজাম পারিজাত সিংহ-এর এক আত্মীয়ের সামরিক-বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু হয়, তাঁকে ইম্ফল পূর্ব জেলার ননগাদা আওয়াং লেইকাই অঞ্চলে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সামরিক বাহিনীর লোকেরা।

৯ জুন : থকোম দোরেনকে আসাম রাইফেলস লামজাও থেকে গ্রেপ্তার করার পরের দিন সকালে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

৮ জুলাই : ইয়াইরিপকে জামখোলেৎ খোঙ্সাই (৫৬) নামক গীর্জার এক ধর্মপ্রাণ যাজককে ভারতীয় সেনাবাহিনী খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলে।

১১ জুলাই : থাংজাম মনোরমা (৩২) নামক মহিলাকে আসাম রাইফেলস বাহিনী বামন কাম্পু মাখা লেইকাই অঞ্চলে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে, কয়েক ঘণ্টা বাদে তাঁর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ মনোরমাকে খুন করার আগে সেনবাহিনী তাঁকে ধর্ষণ করে ও তার ওপর ভয়ানক অত্যাচার চালায়।

১৫ আগস্ট : পেবম চিত্তরঞ্জন নামক এক ছাত্র নেতা এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদে ও সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে নেওয়ার দাবিতে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন।

তথ্যসূত্র : ১। *'হিউম্যান রাইটস্ রিভিউ' ডিসেম্বর ১০, ২০০২ সংখ্যা—প্রেটেড ইণ্ডিজেনাস পিপলস সোসাইটি মণিপুর কর্তৃক প্রকাশিত।*

২। *'হিউম্যান রাইটস্ অ্যালার্ট,' মণিপুর প্রকাশিত মণিপুর আপডেট ভলিউম-I, ইস্যু-III.*

৩। *'ইম্ফল ফ্রী প্রেস' দৈনিক পত্রিকার ২৪, ২৬ ৩০ ও ৩১ জুলাই এবং ২ ও ২০ আগস্ট, ২০০৪ সংখ্যা।*

- সৈন্যবাহিনীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি : গত ১৪ বছরে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৬৬ জন সেনাকে বাড়াবাড়ি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
- "ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের রক্তপান করতে চায়। তবে তাই হোক। আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত। মানবতা এর বিচার করুক।"—মেইরা পাইবি উবাচ।
- ১১ মার্চ '৯৬-এ হুইসু গ্রামে আসাম রাইফেলস্ যে সামরিক অভিযান চালায় তাতে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি লুঠ হয় অথবা পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়। আসাম রাইফেলসের ২০নং ব্যাটেলিয়ন পকেটস্থ করে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। এই সামরিক অভিযানে গোটা গ্রামটাকে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়।
- সামরিক বাহিনীকৃত ধর্ষণের অধিকাংশ ঘটনাই অগোচরে থেকে যায়। কারণ ধর্ষিতার বাড়ির লোকজন ভয় পায়, সমাজের চোখে তারা হেয় হয়ে যাবে। তাছাড়া আইনী-লড়াইয়ে প্রবল ক্ষমতাশালী সামরিক বাহিনীর সাথে এঁটে ওঠা মুশকিল ; এর সাথে আছে বিচার চলাকালীন অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া।

দম্ভ দেখানো তদন্ত—বিচারের নামে প্রহসন

কুমারী থাংজাম মনোরমার হত্যাকাণ্ড ও তার তদন্তের জন্য এক সদস্যের যে কমিশন গঠন করা হয়েছে তার প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মণিপুর জুড়ে। এই বিষয়ে, বিশেষত ওই কমিশন গঠনের বৈধতা সম্পর্কে, 'ইম্ফল ফ্রী প্রেস' নামক দৈনিক পত্রিকার ২ আগস্ট ২০০৪ সংখ্যায় একটি আলোচনা করেন প্রবীণ আইনজীবী আর.কে.নকুলসানা। শ্রী নকুলসানা রচিত নিবন্ধটির মূল অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল।

সমাজের একটা অংশ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে এমন একটা মত প্রকাশ করেছে যে মনোরমার হত্যাকাণ্ডের জন্য যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে তাতে জন-সাধারণের দাবি উপেক্ষা করা হয়েছে, এই তদন্ত কমিশন আসলে এক পণ্ডশ্রম, তদন্ত কমিশনের নাম করে এটাকে গঠন করা হয়েছে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই।

অনেক কারণের মধ্যে দুটো কারণে এই তদন্ত কমিশনের বিরুদ্ধে জনতা ক্ষুব্ধ হতে পারে। এক, অতীতেও অনেক তদন্ত কমিশন গঠন হয়েছে এবং তাদের রিপোর্টও জমা পড়েছে। কিন্তু তেমন কোন পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। সেইজন্য মনোরমার হত্যাকাণ্ডে তদন্ত কমিশন বসানোটাকে অনেকেই মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা বলে মনে করছেন।

দ্বিতীয় কারণ, তদন্ত কমিশন যেভাবে গঠন করা হয়েছে তার বৈধতা নিয়ে সংশয়। এই বিষয়ে একটি মতামত এরকম—কুমারী মনোরমা দেবীর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার, তদন্ত কমিশন আইনের ৩(১) ধারা অনুসারে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী সি. উপেন্দ্র সিংকে এক সদস্যের এক তদন্ত কমিশনে নিযুক্ত করেছে। এই গোটা ব্যাপারটাই আসলে এখানে অপ্রয়োজনীয়। সশস্ত্রবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৫৮-নামক যে আইনটি এখানে চালু আছে সেই আইন অনুসারে এরকম কোনো তদন্ত কমিশন গঠন আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়—এটাই জনসাধারণের এক অংশ মনে করেন। ওই আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী যে কোন এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণা করা যায়। ৪নং ধারায় বলা হয়েছে উপদ্রুত অঞ্চলে চালু যে কোন আইন যে কোনরকমভাবে অমান্য করার জন্য, যে কোন ব্যক্তির উপর যে কোন ভার-প্রাপ্ত বা ভারপ্রাপ্ত নয় এমন অফিসার অথবা তার সমপদাধিকারী যে কোনো সশস্ত্র বাহিনীর কর্মচারী গুলি চালাতে পারে বা এমন বলপ্রয়োগ করতে পারে যাতে ওই ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সংক্ষেপে বললে, সশস্ত্রবাহিনীর যে কাউকে গুলি করে মারার অধিকার রয়েছে। স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ—সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, কুমারী মনোরমা দেবী নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য ছিলেন এবং তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাতেই তাঁর উপর গুলি চালানো হয়েছিল। এর থেকে এটাই মনে হয় যে আত্মপক্ষসমর্থনে সশস্ত্র বাহিনীর কৈফিয়ৎ হল, মনোরমাকে গুলি করা ও খুন করা প্রয়োজনীয় ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই আইনের ৬নং ধারা যেখানে সশস্ত্র বাহিনীর অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে। এই ধারার প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দেওয়া হল : "এই আইন মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য বা সেই উদ্দেশ্যে যে কেউ যে কোনরকম কাজ করলেও তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করা, মামলা রুজু করা বা কোন রকম আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রথম অনুমোদন নেওয়া হচ্ছে।"

অতএব মূল প্রশ্নটি হয়ে দাঁড়ালো, "সশস্ত্র বাহিনীর হাতে মনোরমা দেবীর মৃত্যুর ঘটনায় এক সদস্যের যে তদন্ত কমিশন মণিপুরের রাজ্য সরকার গঠন করেছে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন আগাম অনুমোদন কি গ্রহণ করা হয়েছে?" ৬নং ধারা অনুসারে এই কেন্দ্রীয় সরকারী অনুমোদনটি গ্রহণ করা আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। অন্যথায় এই তদন্ত কমিশন গঠন ও পরবর্তীকালে কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ততটুকুই মূল্য থাকবে যতটুকু অন্যান্য আইনী পদক্ষেপ সম্পর্কে ৬নং ধারায় বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিশন আইনের ৫(৫) ধারা অনুযায়ী তদন্ত কমিশনের বিচার বিভাগের বিচারের সম মর্যাদা দিতে হবে। আবার এই আইনের ১২(২) বি ধারা অনুযায়ী তদন্তের ধরনটিও বিচারযোগ্য। কাজেই এই কমিশনের তদন্তও সাধারণভাবে অন্যান্য আইনী পদক্ষেপের মতোই পড়ে যাবে ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন দরকার হবে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এক্ষেত্রে তদন্তের জন্য কোন আগাম অনুমতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। আর এটাই হল এই তদন্ত কমিশন গঠনের বৈধতার ও আইনগত অন্তর্নিহিত ত্রুটি।

সংবাদ মাধ্যমে জনগণের যে দাবি সামনে উঠে আসছে তাতে রাজ্য সরকারকে এই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করার ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে এর আগে বিভিন্ন ঘটনায় যে সমস্ত তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল সেগুলোর রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা হয়নি এবং তদন্ত কমিশনগুলোর নির্দেশিত কোন পদক্ষেপ বাস্তবে গ্রহণ করাও হয়নি।

মুর্শিদাবাদ থেকে মণিপুর ... ৩৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ

মুর্শিদাবাদের গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের শিষ্য মণিপুরের মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র। বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরের রাজধর্মে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষও তা গ্রহণ করে।

মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের বড়ো গোবিন্দ বাড়িতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের শ্রীপাঠ আছে। এটি বৈষ্ণবদের, বিশেষ করে মণিপুরীদের তীর্থ হিসেবে খ্যাত। রসকীর্তনের উদ্ভাবক ও প্রচারক শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এবং মণিপুরী নৃত্যের উদ্ভাবক ও প্রচারক মণিপুরী মহারাজের সমাধি বড়ো গোবিন্দ বাড়িতে একই ঘরে পাশাপাশি রয়েছে। সমাধির নীচে মার্বেল পাথরের ওপর লেখা রয়েছে : 'মণিপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীল ভাগ্যচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সমাজ। তিরোধান আশ্বিনী শুক্লা তৃতীয়া।' পাশে অন্য ফলকে রয়েছে : নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সমাজ। তিরোধান আশ্বিনী কৃষ্ণপক্ষীয়া। আজও মণিপুরের মানুষ পূজা ও তর্পণ করতে এখানে আসে।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে মণিপুরী নৃত্য জনজীবন ও গণসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে যায়। ভারত সরকারের 'সঙ্গীত নাটক একাডেমি'-র পৃষ্ঠপোষকতায় মণিপুরে 'জওহরলাল নেহরু মণিপুরী ড্যান্স একাডেমি'-তে এই নৃত্য-শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশে এখানকার শিক্ষার্থীরা নৃত্য প্রদর্শন করে। মণিপুরের মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের সপ্তম পুরুষ অধ্যক্ষ প্রিয়গোপাল সানার নেতৃত্বে জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে ১৯৮২ সালের ২৪-২৬ জানুয়ারি মণিপুরী নৃত্যানুষ্ঠান হয়। অতএব মণিপুর মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

৯ অক্টোবর ২০০৪

মুহাম্মাদ হেলালউদ্দীন
খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ

কেইথেল

মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী স্বদেশি বিপণন কেন্দ্র

শমীক সরকার

মণিপুর থেকে ফিরে এসে যখন আমি ওখানে কী দেখলাম, তার বর্ণনা দিচ্ছি আমার চেনা-অচেনা মানুষদের, তখন আমার দু'জন বান্ধবী এ সব শুনে দুটি প্রশ্ন করেছিল। একজনের জিজ্ঞাস্য ছিল : 'মণিপুর কি মহিলা-ডমিনেটেড?' আরেকজনের প্রশ্ন ছিল : 'এরকমও তো হতে পারে, পুরুষরা কোনো কাজ করে না, মেয়েদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয় আর নিজেরা শুধু খেয়ে পড়ে থাকে?'

আসলে আমি যা দেখেছিলাম, তা-ই বলেছিলাম ওদের। যেমন, রাস্তাঘাটে মেয়েরা ছেলেদের সমান হারে উপস্থিত; ক্ষেতের কাজেও প্রায় তাই; বিভিন্ন ধরোয়া শিল্প, যেমন, তাঁত, মাছ ধরাতে মেয়েদের উপস্থিতি অনেক বেশি; মণিপুর-এর বেশির ভাগ বাজারই অস্থায়ী বাজার, আর সেগুলিতে যারা বসে তারা সবাই মহিলা।

অস্থায়ী বাজার। কথাটার মধ্যেই স্থায়ী বাজারের একটা কথা লুকিয়ে থাকে। আসলে, এই ভাগাভাগিটা আমারই করা। মণিপুরে কিছু দোকান-সমষ্টি (বা, বাজার) আছে যেগুলি-র স্থায়ী কাঠামো আছে। সিমেন্টের বা মাটির। সেগুলিতে পুরুষ-মহিলা দু'তরফেরই উপস্থিতি যথেষ্ট, বরং শহরের দিকে পুরুষরাই বেশি। বাকি বাজারটি অনেকটা আমাদের গ্রামের হাটগুলির মতো। টিনের একচালা একটা বড় চতুর্দিক খোলা কাঠামো। নীচটা একটু উঁচু করে সিমেন্ট করা বা মাটির, তার উপর সার বেঁধে বসে আছেন মহিলারা। হরেকরকম কৃষিজ বা কুটির শিল্পজ পণ্যের পসরা সাজিয়ে। কী নেই সেখানে, হরেকরকম সব্জি থেকে শুরু করে শুঁটকি মাছ, মাটির হাঁড়ি-কলসি থেকে শুরু করে চন্দন মাটি, পূজার বিবিধ উপকরণ, কাপড়-চোপড় বা ইনাফি (ওড়না-র মতো), ফানেক (লুঙ্গির মতো), মেয়েদের অলঙ্কার। সকালে শুরু হয় বাজার। ক্ষেত থেকে বা বাড়ি থেকে পসরা নিয়ে মূলত ত্রিশোর্ধ মহিলারা আসেন আশেপাশের অঞ্চল থেকে। পুজো করে পসরা সাজিয়ে বসেন। সূর্যের আলো ডুবতে না ডুবতেই সাঙ্গ হয় বিকিকিনি। তখন পসরা গুটিয়ে ঘরে ফেরার পালা। শহরের বাজারগুলিতে আসেন শহরকে ঘিরে থাকা গ্রামগুলির মহিলারা। ক্যান্টর (বাস) বা জিপ-এ, কখনো কখনো গরুগাড়িতে। এই বাজারগুলির নাম কেইথেল। অর্থাৎ, মেয়েদের বাজার। রাজধানী ইম্ফলের কেন্দ্রে, কাংলা দুর্গের পশ্চিমদিকে খোয়াইরিমবান্ধ বাজারের মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে বড়ো কেইথেল, ইমা কেইথেল। অর্থাৎ, মায়েদের বাজার, একদম আমাদের গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলির মতো। তবে অনেক অনেক বড়ো, আর দোকানিরা অনেক বেশি পরিপাটি বেশভূষার। বেশির ভাগেরই কপালে চন্দনের তিলক। আমরা অনেকগুলো ফটো তুলেছিলাম তাঁদের। অবাক হননি তাঁরা কেউই। ইমা কেইথেল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহিলা পরিচালিত বাজার। কাংলা দুর্গ, গোবিন্দজী মন্দির বা লোক্-টাক্ লেকের মতোই মণিপুরের এক দ্রষ্টব্য স্থান।

মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের AVRC (অডিও ভিস্যুয়াল রিসার্চ সেন্টার)-এর ব্যবস্থাপনায় কেইথেল নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখার সময় আমরা জানতে পেরেছিলাম, কেইথেলগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্যাটেলাইট, রিজিওনাল এবং লোকাল। স্যাটেলাইট অর্থাৎ বড়ো বড়ো কেইথেলগুলি মূলত জেলাভিত্তিক। রিজিওনাল কেইথেল-এর সংখ্যা বেশি এবং অনেক ছোটো। মূলত অঞ্চলভিত্তিক। এছাড়া আছে প্রচুর স্থানীয় বা লোকাল কেইথেল। এগুলি ছোটো ছোটো। মণিপুর রাজ্যটি তো খুব বেশি বড়ো নয়। লোকসংখ্যা আমাদের দক্ষিণ কোলকাতার চেয়েও কম। এই মানুষদের মধ্যে আবার আছে উপত্যকার মানুষ, যারা মূলত মৈতেই; আর পাহাড়ী মানুষরা মূলত উপজাতি বা ট্রাইবাল, বেশ কতগুলি কেইথেল আছে, যা ট্রাইবাল কেইথেল। যেমন, তামেংলঙ, মাও, চুড়াচাঁদপুর বাজার। আবার অন্যান্য কেইথেলগুলিতেও ট্রাইবালদের জন্য (উপত্যকাবাসীদের কথায়, অ-মৈতেইদের জন্য) আলাদা জায়গা আছে। আসলে, কেইথেলে প্রত্যেক পসারিনীর জায়গা নির্দিষ্ট আছে। মায়েরা অক্ষম হয়ে পড়লে সেই জায়গায় বসতে শুরু করে তার মেয়ে। অনেক কেইথেলে, বিশেষত বড়ো বড়ো কেইথেলগুলিতে টিনের কাঠামো ছাড়িয়ে রাস্তায় বা খোলা আকাশের নীচে সম্প্রসারিত হয়েছে বাজার। পসরা সাজিয়ে বসেছে মেয়েরা। বয়সে তারা তরুণতর। ১৯৭০-এর দশকে কেইথেলের পসারিনীদের গড় বয়স ছিল মধ্য চল্লিশ। এখন তা প্রায় তিরিশ।

কেইথেল-এর উদ্ভব হল কবে? সঠিক জানা যায় না। অনেকে বলেন প্রায় দু'হাজার বছর আগে। বহুদিন ধরে চলেছে বিনিময় প্রথা বা বার্টার সিস্টেম। অনেকের মতে, একশ বছর আগেও কেইথেলগুলিতে বিনিময় ব্যবস্থা চলত।

কেইথেলগুলি চলে কীভাবে? না, কেইথেলের কোনো আলাদা সংগঠন বা সমিতি নেই। সংকট উপস্থিত হলে কেইথেলের মেয়েরা মিটিং করতে বসে যায় নিজেদের মধ্যে। এছাড়া আছে দৈনন্দিনের স্বাভাবিক কথোপকথন। এসবের মধ্যে দিয়েই কোনো প্রবীনা, প্রাজ্ঞ-পসারিনী নেত্রীর মর্যাদা পান। এরকমই একজন ইমা কোম্বি। ইমা কেইথেল-এর এক নেত্রী। অতি সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বললেন, তিনি শুধু ইমা কেইথেলের নেত্রী নন, মণিপুরি সমাজেরও নেত্রী।

প্রথমে আমি কথাটাকে মেলাতে গেছিলাম আমার চেনা উদাহরণগুলোর সাথে। যেমন, একই সাথে যুব সমাজের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী, বা শ্রমিকদের নেতা এবং শহরের মেয়র ...। ভুল ভাঙলো কেইথেল এবং মণিপুরি সমাজের আন্তঃসম্পর্কের ভূত এবং বর্তমান সম্পর্কে অবহিত হয়ে। রাজার আমলে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হতো কেইথেল-এর সামনে। রাজাজ্ঞা ঘোষিত হত কেইথেলে। সেই সময় থেকেই কেইথেল এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন গ্রামের, অঞ্চলের মানুষে এই দৈনিক মিলনমেলার মাধ্যমে খবর ছড়ায় রাতারাতি, প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। আজও তা পাল্লা দেয় শক্তিশালী, আধুনিক গণমাধ্যমকে। মনোরমা দেবীর ধর্ষণ এবং হত্যার প্রতিবাদে মণিপুর সমাজের আন্দোলন-এর পথে গড়ে ওঠা যৌথমঞ্চর সাথে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাতিল-এর কথোপকথন ব্যর্থ হবার পর সব থেকে আগে সাড়া দেয় কেইথেলগুলি। হরতাল শুরু হয়ে যায় সেগুলিতে।

গ্রামপ্রধান, কৃষিভিত্তিক মণিপুরি সমাজ আজও ঐক্যবদ্ধ হয় কেইথেলের খবরে। এবং কখনও কখনও, কেইথেল থেকেই।

মনোরমার ধর্ষণ এবং হত্যার অব্যহিত পরেই ১৫ জুলাই কাংলা দুর্গে আসাম রাইফেলস্-এর সদর দফতরের সামনে যে বারোজন মহিলা ঐতিহাসিক নগ্ন-বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, তাঁরা সবাই ইমা কেইথেলের দীর্ঘদিনের পসারিণী। ১৯৩৯ সালে 'নুপি লা' নামে খ্যাত নারী-যুদ্ধেও কেইথেল থেকেই ডাক এসেছিল।

মণিপুরি সমাজের সাথে কেইথেল-এর সংযোগ ওতপ্রোত। তাই, সবচেয়ে বড়ো কেইথেল, ইমা কেইথেল-এর দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহ থেকে

উঠে আসা নেত্রীকে সমাজ সহজেই নেত্রী হিসেবে বরণ করে নেয়, কোনোরকম নির্বাচন বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই। বেশির ভাগ কৌমসমাজের মতোই মণিপুরে কৌম সমাজ এবং তার অঙ্গ কেইথেলে আনুষ্ঠানিকতার অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কেইথেলগুলির মধ্যে একধরনের সংযোগ রয়েছে। অনেকে বলেন, কেইথেলগুলি চলে অনেকটা সিন্ডিকেটের মতো। কোনো লিখিত আইনকানুনও নেই কেইথেল-এর।

ইমা কেইথেল-এ যদি কেউ যান, তবে চোখে পড়বে, এই বাজারটিকে যেন ঘিরে ফেলেছে 'সভ্যতা',। একদিকে তৈরি হচ্ছে বড়ো ব্রিজ, রাস্তার উপর দিয়ে। অন্যদিকে আধুনিক বাজার। কংক্রিটের কাঠামো-রাজি। ভোগ্যপণ্যের পসরা। কেইথেল বাজারকে যেন গিলতে চাইছে আধুনিক বিশ্ব-বাজার, মার্কেট। ইম্ফলের অবস্থাপন্ন মানুষদের কেউ কেউ কেইথেল নিয়ে বিরক্ত। কারণ তা বড্ড নোংরা, 'আনহাইজেনিক' বা অস্বাস্থ্যকর। বর্জ্য ফেলার কোনো ব্যবস্থা নেই। ইন্টারনেটে দু'জন মণিপুরির বিতর্ক পড়েছি। তাতে একজন বলছেন, মণিপুরে এইমুহূর্তে কর্পোরেটাইজেশন শুরু করা উচিত। কেইথেলগুলির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আরেকজন বলছেন, না, এখনি সেখানে কর্পোরেটদের নয় বরং মনিপুরের স্বাধীন উদীয়মান শিল্পপতিদের উৎসাহদান করা উচিত। কলকাতায় বিপ্লবী বাম রাজনৈতিক কর্মীদের একটা অংশকে দেখেছি, যারা এই নতুন শিল্পোদ্যোগ-এর ফলে তৈ হওয়া নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকদের ভূমিকা, বিশেষত বর্তমান আন্দোলনে—তা নিয়ে প্রবল উৎসুক। বড়ো বড়ো কেইথেলগুলিতেও কতিপয় পসারিনীকে চোখে পড়ে, আধুনিক ভোগ্যপণ্যের সম্ভার নিয়ে। মনিপুরি সমাজে, বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে বেকারী ক্রমশ বাড়ছে এবং স্বভাবতঃই বাড়ছে আধুনিক শিল্পোৎপাদন এবং বাজারের চাহিদা। বড়ো বড়ো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় দেখেছি, মনিপুরের 'সমস্যা'-র শিকড় তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন সেখানকার 'অনুন্নত' অর্থনীতি ও পরিকাঠামো, রেলযোগ না থাকা, এক পয়সাও বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) না থাকার মধ্যে।

আর এসবের মধ্যেই কেইথেলগুলি রয়েছে, স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপূরক বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে, এক শক্তিশালী গণমাধ্যম হয়ে, মনিপুরি সমাজের বিশেষত উপত্যকা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারক হয়ে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৌমসমাজের স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে।

কেইথেল-কথার আলোকে একদম শুরুর প্রশ্ন দুটিকে একবার ঝালিয়ে নিলে কেমন হয়?

সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের কয়েকটি ধারা

ধারা ৩ যদি আসাম সরকার অথবা মণিপুরের চিফ কমিশনার (মণিপুর সরকার) মনে করে আসাম রাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মণিপুর (মণিপুর রাজ্য)-এর সমগ্র অথবা কোনও অংশ এমন এক বিশৃঙ্খল অথবা বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে যে, পুর ক্ষমতার সহযোগিতায় সশস্ত্র ক্ষমতা প্রয়োগ দরকার তাহলে তিনি, অফিসিয়াল গেজেটের নোটিফিকেশন মারফত সেই রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সর্বত্র অথবা কোনও অংশকে উপদ্রুত এলাকা হিশেবে ঘোষণা করতে পারেন।

ধারা ৪ উপদ্রুত এলাকায় যে কোনও কমিশন্ড অফিসার, ওয়ারান্ট অফিসার, নন-কমিশন্ড অফিসার অথবা সশস্ত্র বাহিনীর সমানুপাতিক পদে আসীন কোনও ব্যক্তি—

(ক) যদি তিনি পাবলিক অর্ডার রক্ষার জন্য দরকার মনে করেন, প্রয়োজন মতো সতর্কতা জ্ঞাপন করার পর মৃত্যুও ঘটতে পারে এমন ধরনের গুলিচালনা অথবা বলপ্রয়োগ করতে পারেন উপদ্রুত এলাকায়, এমন ব্যক্তির ওপর, যিনি আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন, পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ করতে পারেন অথবা অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র, সামরিক সম্ভার অথবা বিস্ফোরক পদার্থ হিশেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন অস্ত্র অথবা সামগ্রী বহন নিষিদ্ধ করতে পারেন।

(খ) যদি তিনি দরকার মনে করেন, অস্ত্র-স্তূপ, প্রস্তুতিমূলক অথবা আত্মরক্ষামূলক অথবা এমন আশ্রয় যেখান থেকে সশস্ত্র আক্রমণ করা হচ্ছে অথবা হতে পারে অথবা চেষ্টা হতে পারে, কিম্বা এমন এক কাঠামো যা সশস্ত্র কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির অথবা সশস্ত্র দলের কোনও অপরাধে জড়িত আত্মগোপনকারীর গোপন ডেরা, সেগুলি তিনি ধ্বংস করতে পারেন।

(গ) পরোয়ানা ছাড়া এমন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, যিনি কোনও বোধগম্য অপরাধ করেছেন অথবা যাঁর বিরুদ্ধে কোনও বোধগম্য অপরাধ করার বা করতে পারেন এমন যুক্তিযুক্ত সন্দেহ করা চলে এবং গ্রেপ্তার করার জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করতেও পারেন।

(ঘ) যে কোনও স্থানে পূর্ব উল্লিখিত গ্রেপ্তারের জন্য পরোয়ানা ছাড়াই প্রবেশ ও তল্লাসি চালাতে পারেন, অথবা যে কোনও ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আটক বা অবরুদ্ধ করা হয়েছে বলে মনে হলে উদ্ধার করতে পারেন, অথবা এমন সম্পদ যা যুক্তিযুক্তভাবে চুরি করে আনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, অথবা কোনও অস্ত্র, সামরিক সম্ভার বা বিস্ফোরক পদার্থ যা বেআইনীভাবে সেই স্থানে রাখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে দরকার হলে যথাযথ বলপ্রয়োগ করা যেতেও পারে।

ধারা ৫ গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করতে হবে—কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে এবং এই আইন অনুযায়ী হেফাজতে নিলে নিকটতম পুলিশ স্টেশনের অফিসার-ইন চার্জের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব হস্তান্তর করতে হবে, সাথে গ্রেপ্তার করার পরিস্থিতি সংক্রান্ত রিপোর্ট দিতে হবে।

ধারা ৬ আইনের অধীনের কর্মরত ব্যক্তিদের রক্ষা— এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা বা সেই অভিপ্রায়ে কিছু করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমোদন ব্যতীত কোনও মামলা, অভিযোগ অথবা অন্য আইনগত প্রক্রিয়া নেওয়া যাবে না।

[১৯৯৬ সালের ১৯ জুলাই এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মণিপুর রাজ্যপাল প্রদত্ত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে : এই আইনে গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই আটক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করতে হবে, গ্রেপ্তারির স্থান থেকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পৌঁছানোর সময় বাদ দিয়ে ২৪ ঘন্টা হিশেব করা হবে। ওই সময়ের বাইরে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ব ছাড়া কাউকে আটক করে রাখা যাবে না।

এছাড়া, বিদ্রোহ দমন কর্মসূচী নেওয়ার সময় নিরাপত্তা বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীকে সঙ্গে পুর পুলিশের প্রতিনিধিদের উপস্থিত রাখতে হবে এবং যেখানে একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ওই কর্মসূচীতে উপস্থিত থাকা দরকার, ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সেখানে সংশ্লিষ্ট একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে যথেষ্ট অগ্রীম সংবাদ জ্ঞাপন করতে হবে।]

রাষ্ট্র, সিভিল সোসাইটি এবং মণিপুরী কৌমসমাজ

জিতেন নন্দী

মণিপুরে প্রায় ৫৫ বছর ধরে একটা গণপ্রতিবাদ রয়েছে। আর রয়েছে সেই প্রতিবাদ ঘিরে একটা আন্দোলন। একটা রাজ্য, খুবই ছোট্ট, তার সামান্য জনসমষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র রাজাকে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে একটা 'অন্তর্ভুক্তি চুক্তি' করেছিল সবে স্বাধীনতা পাওয়া ভারত রাষ্ট্রের সরকার ১৯৪৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। সেদিন যে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এক খোঁচায়, তার সদস্যরা নিশ্চয় খুশি হননি। সিভিল সোসাইটির শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ অথবা সরকারি কর্মচারীরও অপমানিত বোধ করেছিল নিশ্চয়। সেদিন সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিল বোধহয় মণিপুরী কৌমসমাজ। 'বোধহয়' বলছি একারণে, কেননা সেদিনকার প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু আজকের ২০০৪ সালের ঘটনাগুলো থেকে যেন তার একটা আন্দাজ পাচ্ছি। মণিপুরে গিয়েও সেটা উপলব্ধি করেছি। কোথায় যেন গোটা সমাজটার অন্তঃস্থলে একটা আঘাত, একটা স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। আর তাই মণিপুরের সমস্যার টুকরো আপাত কোনও সমাধান হয় কিনা আমার জানা নেই।

৫৫ বছরের আন্দোলন কখনও গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছে, কখনও মৌন হতাশা অপমানে একটা সমাজকে চির কুণ্ঠিত করে রেখেছে, কখনও আবার রাষ্ট্রীয় নজিরবিহীন অত্যাচারের সংগঠিত যৌথ প্রতিবাদ না করতে পারায় তা অভিমানী যুবক-যুবতীদের জঙ্গি বিক্ষোভের রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্র তার গালভরা নাম দিয়েছে— ইনসার্জেন্সি। রাষ্ট্রের গায়ে সেঁটে থাকা ঐতিহাসিক এবং ক্ষমাহীন অপরাধকে ন্যায্যতা দেবার সুন্দর একটা সুযোগ— ইনসার্জেন্সি। আর তাকে তো বর্বরভাবে দমন করতে হবেই!

১৫ জুলাই ২০০৪ দুপুরের পর থেকে এই ৫৫ বছর ব্যাপী আন্দোলন একটা গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর টানা একমাস ধরে তা চলেছে মণিপুর জুড়ে। এই গণআন্দোলনের চরিত্র ছিল অহিংস, কিন্তু মোটেই নরম-সরম গুটিয়ে থাকা নিরামিষ আন্দোলন নয়। ১৫ জুলাই ইমা অর্থাৎ মায়েদের বাদ ছিল ভয়ানক আক্রমণাত্মক। গ্রামীণ কৌমসমাজের একেবারে অন্তঃস্থল থেকে, যেন মায়েদের জঠর থেকে উঠে আসা একটা ভয়ানক প্রতিবাদ। সিভিল সোসাইটির সাজানো গোছানো ভদ্র দিনযাপনের কাপড়-চোপড় টান মেরে খুলে রাস্তার ওপর ন্যাঙটা করে দিয়েছে সেই প্রতিবাদ। কাঙলা দুর্গের আসাম রাইফেল্‌স জওয়ানদের মতোই যেন তার সামনে পড়ে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে দাপুটে রাষ্ট্র।

মায়েরা সকালবেলা ঘর থেকে ঠাকুর প্রণাম সেরে শুদ্ধ অথচ ক্ষুব্ধ মন নিয়ে ওই প্রতিবাদে অংশ নিতে এসেছিলেন। ওঁদেরই মেয়ে মনোরমা রাষ্ট্রের হাতে ধর্ষিত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। হতে পারে সে জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বা সমর্থক কোনও কিছু একটা ছিল। কিন্তু মণিপুরী সমাজটাকে বদলে দেবার স্বপ্ন দেখে যে জঙ্গী ছেলে বা মেয়ে, সকলে তো তাঁদেরই সন্তান। তারা একের পর এক রাষ্ট্রীয় নৃশংসতার বলি হবে, আর তাদের মায়েরা নিরুত্তাপ দিনযাপন করে যাবেন, সেটাই বা কীভাবে হয়? তাই ১৫ জুলাই গায়ের কাপড় খুলে ফেলে কাঙলা দুর্গের সামনে প্রতিবাদ চলাকালীন যখন পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁরা কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তাঁদের আটক রাখা হবে ঠিকই, কিন্তু মনোরমার তো সেটুকুও জোটেনি। চূড়ান্ত অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাঁদের মেয়েকে। 'আমরা প্রত্যেকে মনোরমার মা'— এ কোনও শেখানো বুলি বা শ্লোগান নয়। মণিপুরী সমাজের কাছে মায়েদের পেশ করা এক চূড়ান্ত সতর্কতা, এক অন্তিম হুঁশিয়ারী।

২

সিভিল সোসাইটিতে আজ আন্দোলন খুবই রুটিনমাফিক চেহারায় পর্যবসিত হয়েছে। কি ছাত্র আন্দোলন, কি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অথবা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী সবই কেমন যেন টিপ্-টপ্ নিয়ন্ত্রিত একটা চেহারা নিয়েছে। কোনও আন্দোলনের কর্মসূচী নেবার পরের দিন খবরের কাগজ, কিম্বা সেইদিনই টিভির পর্দায় কভারেজ পেলেই সামান্য স্বস্তি। যা হোক কিছু তো হল! গণআন্দোলন আজ যেন প্রবীণদের মুখে শোনা পুরনো গল্প-স্মৃতিকথার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের বাস্তবে তা অস্তিত্বহীন। আন্দোলনের পদক্ষেপ হিশেবে কর্মবিরতি, ঘেরাও, ধর্মঘটও আজ নিছক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মণিপুরের গণআন্দোলন তাই কিছুটা ব্যতিক্রমী এক ঘটনা। তিনটে ঘটনা এই গণআন্দোলনকে প্রত্যক্ষ রসদ জুগিয়েছে। **প্রথম**, শর্মিলা'র সাড়ে তিন বছর ব্যাপী অনশন, ২৪ বছর ধরে সমাজের বুকে চেপে থাকা একটা কালা আইনের শেকল ভাঙার অসম্ভব জেদ। **দ্বিতীয়**, এবছরের শুরু থেকেই হত্যা, ধর্ষণ, নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার ব্যাপকতা এবং তারই ধারাবাহিকতায় মনোরমা হত্যার ঘটনা। আসাম রাইফেল্‌স অ্যারেস্ট মেমো ইস্যু করায় ওর পরিবার ও প্রতিবেশীরা অভিযোগ জানানোর একটা হাতিয়ার পেয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রে অ্যারেস্ট মেমো না পাওয়ায় প্রতিবাদী মানুষেরা সরকারকে ঠিকমতো প্রমাণ সহ চেপে ধরতে পারে না। এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। ফলে মনোরমার মৃতদেহ পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ তুলে ধরা গিয়েছিল। আর দোষীদের শাস্তি দাবি করার পাশাপাশি কালা আইন রদ করার দাবি তোলায় আন্দোলনকে গণচরিত্র দেবার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। **তৃতীয়**, ১৫ জুলাইয়ের বারোজন মায়ের তীব্র প্রতিবাদ গণআন্দোলনের আগল খুলে দিয়েছিল।

৩

গণআন্দোলনের আগল খুলে যাওয়ার ঘটনা সর্বত্রই আজকের দিনে বেশ বিরল। রাষ্ট্রের নির্মম সন্ত্রাসবাদী এবং সুকৌশলী চেহারা নিশ্চয় আগের থেকে এখন জনসাধারণকে অনেকখানি ব্যক্তিগত স্তরেই সন্ত্রস্ত করে রাখে। সিভিল সোসাইটির শহুরে আধুনিক প্যাটার্নের জীবনযাত্রায় এমনিতেই আমরা আজ অনেকখানি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন। সেই প্যাটার্নটা গ্রাম্য জীবনেও বেশ অনেকটা প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু গণআন্দোলনের আরও প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্তি হিশেবে সামনে উঠে এসেছে আধুনিক মিডিয়া।

মণিপুর উপত্যকা, যেখানে মিতেই কৌমের বসবাস প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি, প্রায় দু'হাজার বছর ধরে এক চাষবাস ভিত্তিক কৌমজীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা, আসাম তথা উত্তর ভারতের কৃষিজীবী সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে এক স্বাভাবিক সম্পর্ক ওখানে গড়ে উঠেছে। বাংলা ও আসামের মানুষের সঙ্গে মণিপুরীদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আর একটু গভীর এবং ব্যাপক হয়েছিল, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কও দেখা গেছে। এই কৌমজীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য হল একটা গ্রামীণ কেন্দ্রাভিমুখী জোটবদ্ধতা। মণিপুরের, বিশেষত ইম্ফল এবং তার আশপাশে মেয়েদের নিজেদের বাজার—কেইথেল— দেখলে বোঝা যায়, যেন একটা

সৌরমণ্ডলের মতো গ্রামস্তর থেকে বৃহত্তর এলাকার স্তরগুলি পর্যন্ত কতগুলি বৃত্তাকার কক্ষপথে গ্রহ উপগ্রহের মতো ওই বাজারগুলি আবর্তিত হচ্ছে। মেয়েরা গ্রাম থেকে চাষ এবং শিল্পগত উৎপাদনসামগ্রী নিয়ে বাজারগুলিতে আসছে প্রতিদিন, প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে একধরনের কৌমগত জোটবদ্ধতা স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত হয়ে চলেছে। মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের গোষ্ঠী জীবনেও উপত্যকার এই জীবনযাত্রার ছাপ রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কৌমগত প্রতিরোধ মণিপুর উপত্যকার ঐতিহ্য। ১৯৩৯ সালে বৃটিশ সেপাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে ইম্ফলের খোয়ারিমবান্দ-এর ইমা কেইথেল—মায়েদের বাজার— সংগঠনের ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৮০ সালে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে মণিপুরের গ্রামে-গ্রামে, শহরের এলাকাগুলোতে কালাকানুনের সন্ত্রাস নামল। স্বতস্ফূর্তভাবেই তৈরি হল কৌমের ভিতর থেকে মশালধারী মেয়েদের প্রতিরোধ বাহিনী—মেইরা পাইবি। এই স্বতস্ফূর্ততা ঐতিহ্যগত। গ্রামের প্রত্যেক ঘরেই তাঁত। আর সেই তাঁত থেকে সুতো টানার 'তেম' খুলে হাতে নিয়ে মেয়েরা পথে বেরিয়ে পড়েছে অতীতেও। মশাল আর তেম হাতে মিছিল করে মেয়েরা বারবার লড়াই করেছে। ১১ জুলাই মনোরমা হত্যার প্রতিবাদে ১২ তারিখ দুপুর ১টার সময় খোয়ারিমবান্দের ইমা কেইথেলের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। মণিপুর কেইথেল নুপি মারূপ ইরাবত ভবনে মিডিয়া প্রতিনিধিদের ডেকে ওইদিন মাঝরাত থেকে ১৬ ঘন্টা ধর্মঘট ঘোষণা করল।

কৌমের সম্বিৎ নিয়ে সিভিল সোসাইটি তৎপর হল। মিডিয়ার মাধ্যমে আন্দোলন প্রচারিত হল। সেই প্রচার সর্বোচ্চ আকার নিল ১৫ই জুলাই মায়েদের উলঙ্গ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। মিডিয়া সাধারণভাবে সিভিল সোসাইটির অঙ্গ। রাষ্ট্রের সঙ্গে তার প্রতিদিনের আদান-প্রদান রয়েছে। কিন্তু মণিপুরে কিছুটা আলাদা ধরনের ঘটনা এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

৪

মণিপুরের গণআন্দোলনে 'গণ'-এর শক্তি হল কৌমের জোটবদ্ধতার শক্তি। আনুষ্ঠানিক সংগঠনের পর্যায়ে এসে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এনজিও বা বেসরকারি স্বেচ্ছা সংগঠন। ১৫ জুলাইয়ের ১২জন তেজস্বী মহিলার একজন হলেন থোকচম রামানি, ৭৫ বছর বয়স। সংযুক্ত মেইরা পাইবি তথা এক বৃহৎ এনজিও 'অল মণিপুর উইমেন সোশাল রিফর্মেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট সমাজ'-এর তিনি সাধারণ সম্পাদক। ৩২ সংগঠনের মোর্চা আপুনবা লুপেরও তিনি নেত্রী। ১৮ই আগষ্ট তাঁকে রাজ্য সরকার গ্রেপ্তার করে।

এনজিও চরিত্রের সংগঠনগুলো নানান মাত্রায় রাষ্ট্র তথা অর্থদাতা সংস্থার (দেশি বিদেশি) সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে। আজকের যুগে সিভিল সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি এইসব এনজিও। মিডিয়ারও কর্পোরেট স্পনসরশিপ এবং রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ রয়েছে। কৌমের নিজস্ব জোট-শক্তির সঙ্গে এই দুই শক্তির অনবরত লেনদেন চলছে মণিপুরে।

মিডিয়া অথবা এনজিও-তে যারা কাজ করছে, সেই কর্মীদের অনেকেরই রয়েছে প্রত্যক্ষ গ্রামীণ যোগাযোগ, কৌমের যোগাযোগ, যাকে বলা যায় নাড়ির টান। তাই মিডিয়ার তোলা আন্দোলনের বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ছবি দেখে কলকাতার দর্শকরা অবাক হয়ে যায়। তারা প্রশ্ন করে, কীভাবে এইসব নগ্ন সত্য ঘটনার চিত্র তোলা সম্ভব হয়েছে? একমাত্র 'গণ' এর সদস্য হিশেবে সংবাদ কর্মী, আলোকচিত্রকরদের কৌমগত একাত্মতা ওইসব ছবি রাষ্ট্রীয় নিষেধের চোখ এড়িয়ে তোলা সম্ভব করে তুলেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

আমরা অনেক সময় দেশকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু মণিপুরের গণআন্দোলনে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম মায়ের আদেশ কাকে বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক অধ্যাপকের কাছেও বত্রিশ বছরের মেয়ে অনশনরত শর্মিলা ইমা, সম্মানে মাতৃতুল্য।

মণিপুরের একজন এনজিও কর্মীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'পেকন চিত্তরঞ্জন আত্মহত্যা করবেন আগেই জানা গিয়েছিল, তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ছবিও অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তোলা হয়েছে। আপনারা ওকে আটকাবার চেষ্টা করেননি?' খুবই বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিয়েছিলেন ওই কর্মী : 'কেন? আটকাবো কেন ওঁকে?' খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম আন্দোলনের 'গণ'-চরিত্রকে, আন্দোলনের সঙ্গে 'গণ'-এর একাত্মতাকে। তারপর যখন দেখলাম সেই ছবি, কাতারে কাতারে মানুষ শোকবস্ত্র পরে কার্ফু অগ্রাহ্য করে চিত্তরঞ্জনের প্রতীকি সৎকারে শামিল হচ্ছে, শোক আর শপথ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, বুঝলাম কোথায় সেই নাড়ির টান।

৫

কেইথেলগুলোতে যখন গেছি, দেখেছি ছোটো কেইথেল থেকে শুরু করে খোয়ারিমবান্দ-এর বিশাল ইমা কেইথেলের চারপাশ জুড়ে এক ধরনের আধুনিক বাজার গজিয়ে উঠেছে। পাকাবাড়িতে স্থায়ী দোকান এবং আধুনিক পণ্যসম্ভার যেন কেইথেলকে ঘিরে ধরছে। বাসে উঠে দেখেছি মণিপুরী ঐতিহ্যগত পোশাকে মেয়েরা রয়েছে, আবার জিন্স-সার্ট পরা যুবতী-কিশোরীরাও রয়েছে। গণআন্দোলনের দিনগুলোতে গ্রাম ও শহরের পথেও সেই মিশ্র চেহারাটা দেখেছি।

সিভিল সোসাইটি আর কৌমসমাজ—সমাজের দুই মুখই মণিপুরে রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের মুখোমুখি। সিভিল সোসাইটির হাত ধরে আসছে বিশ্ববাজার, বিশ্বপুঁজি, কর্পোরেট শক্তি আর আসছে আধুনিক প্রতিযোগিতাময় জীবনযাত্রা। সেই প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ে উপত্যকা ও পার্বত্য মণিপুরের কৌম ও গোষ্ঠী জীবনেও আসছে সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী-কৌমগত সঙ্কীর্ণতার বিদ্বেষ।

গণআন্দোলনের দিনগুলোতে সিভিল সোসাইটিকে কৌমের জোটশক্তি অনেকখানি রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে টেনে এনেছে রাজপথে। এমনকি সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারাও প্রকাশ্যে কালাকানুন বাতিলের পক্ষে সায় দিতে বাধ্য হয়েছে। আদবানী, জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো বড়ো নেতারা যখন একবাক্যে কালাকানুন জারি রাখার পরামর্শ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে, তাদের মণিপুরী অনুগামীরা রাজপথে বসে কালাকুনন রদ করার দাবিতে ভুখ হরতালে অংশ নিয়েছে। এসব মোটেই স্বেচ্ছায় হয়নি। গণ আন্দোলনের চাপ ছাড়া এদের এই ভূমিকার কথা কখনও ভাবাও যেত না।

মণিপুরের গণআন্দোলন আপাতত কিছুটা স্তিমিত। কিন্তু সিভিল সোসাইটির সঙ্গে কৌমের লেনদেন তো চলবেই। সে-লেনদেন থামিয়ে রাখবে কে? আমাদের সামনে প্রশ্ন অন্য, এই অবিরত লেনদেনের প্রক্রিয়ায় কে কাকে আখেরে জয় করে নিতে পারবে? মণিপুরের রাষ্ট্রীয় অন্যায় প্রতিরোধে জয়ের প্রশ্নও বোধ হয় এই প্রশ্নের ফয়সালার সঙ্গে যুক্ত।

মণিপুর বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা নিয়ে মন্থন সাময়িকী'র পাঠকসভা। ৬ নভেম্বর ২০০৪, শনিবার, বিকেল পাঁচটায়, ৪৬বি একবালপুর রোড, কলকাতা-২৩, সেবায়ন নার্সিং হোম সংলগ্ন বাড়িতে। সভায় পাঠকদের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ কামনা করি।

মারূপ

মণিপুরি উপত্যকার সামাজিক সমবায় কথা

শমীক সরকার

মণিপুরি উপত্যকা সমাজে সমবায় ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের। ঐতিহ্যবাহী এই সমবায় ব্যবস্থার মূলধন হল মানুষে-মানুষে নিবিড় সম্পর্ক। এই সমবায়গুলিকেই মৈতেই ভাষায় বলে মারূপ।

এই মারূপ ব্যবস্থার অনেক বৈচিত্র্য আছে। সবচেয়ে পুরনো ধরনের মারূপ হল সিংলুপ মারূপ। একটি অঞ্চলের জন্য এই সমবায় সংঘ মৃতের সৎকার, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এবং তৎসংলগ্ন খরচের ভার বহন করে। বৈষ্ণব-প্রধান মণিপুর উপত্যকার জীবনে মৃতের সৎকার প্রভৃতি একটি খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই সিংলুপ সমবায়ের প্রয়োজন। মৈতেই সংস্কৃতিতে মৃত্যু শোকের চেয়েও ভারী। মৃতের পরিবারের শোক ভাগ করে নেয় গোটা গ্রাম। সমস্ত সিংলুপ সদস্য হাজির হয় শেষযাত্রায়। প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজন মানুষ কিছু টাকা বা মণ্ডপ তৈরির বাঁশ, পোড়ানোর কাঠ প্রভৃতি নিয়ে হাজির হয় সেখানে। কোনও পরিবার থেকে কেউ না গেলে সিংলুপ জরিমানা ধার্য করে।

সিংলুপ ছাড়া আর এক ধরনের আঞ্চলিক সমবায় হল লেইকাই মারূপ। অর্থাৎ 'অঞ্চলের সমবায়'। সিংলুপ মারূপ যেমন মৃতের সৎকারাদির জন্য, লেইকাই মারূপ সেরকম কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নয়। লাই হারৌবা নামক মেতেই উৎসব আয়োজন থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়া পরিবারের ত্রাণ— সবেতেই এই মারূপ ভূমিকা নেয়। প্রতিটি সদস্য পরিবার থেকে ন্যূনতম এবং নির্দিষ্ট বাৎসরিক চাঁদার বিনিময়ে গড়ে ওঠে সঞ্চয়। কখনো কখনো ফসল কাটার মরশুমে চাঁদা হিসেবে প্রাপ্ত ফসল (মূলত ধান) পরে দাম উঠলে বিক্রি করে এই সংঘ সঞ্চয় বাড়িয়ে নেয়। সংঘের সঞ্চয়ে শুধু টাকা থাকে না। থাকে চাষের যন্ত্রপাতি, রান্না খাওয়ার বাসন-কোসন প্রভৃতি।

এই আঞ্চলিক মারূপগুলি স্থায়ী চরিত্রের। কিছু কিছু গ্রামে পুরনো সিংলুপগুলিই লেইকাই মারূপ-এর ভূমিকা পালন করে।

উপরোক্ত দু-ধরনের সমবায় ছাড়াও অধুনা, গত কয়েক দশক ধরে উপত্যকা সমাজ গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের অস্থায়ী সমবায়। এগুলি আঞ্চলিকও নয়। মূলত মাসিক চাঁদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই মারূপগুলি সদস্যদের সাহায্য করে আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে বা চক্রাকারে। এদের মধ্যে অনেকগুলিই শুধু মহিলাদের। বাকিগুলি মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সবার, এই মারূপগুলির সদস্য পরিবার নয়, ব্যক্তি মানুষ। মহিলা সমবায়গুলির নাম থৌনি মারূপ। সদস্যদের পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে, জন্মানুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে এই সংঘগুলি সক্রিয় হয়। পুত্র-কন্যা বা নাতি-নাতনিদের জীবনের আচার-অনুষ্ঠান ভেদে বিভিন্ন থৌনি মারূপ দেখা যায়। এছাড়াও কেইথেলে যে সব মহিলারা বসেন, তাদের বিভিন্ন সমবায় দেখা যায়। এগুলি নির্দিষ্ট পণ্য ভিত্তিক। যেমন ফল বিক্রেতা সমবায় প্রভৃতি। এগুলিতে অনুদান হয় অনেক সময়ই লটারির মাধ্যমে। তবে প্রতিটি মারূপেরই কোনও সদস্য একবার অনুদান পেয়ে গেলে দ্বিতীয়বার পাওয়ার জন্য সাধারণত বিবেচিত হয় না, যদিও চাঁদা প্রদানের ব্যাপারটি চলতেই থাকে।

অবিবাহিত মেয়েদের মারূপ-এর নাম চানুরা মারূপ। এটিও অস্থায়ী এবং আঞ্চলিক নয়। অবিবাহিত মেয়েরা ১০-১১ বছর বয়স থেকেই তাঁত বুনে রোজগার করতে শুরু করে—উপত্যকা সমাজে। সেই রোজগারেরই একটা অংশ মাসিকভাবে মারূপে জমানো হয়। খরচ হয় নিজেদের বিয়ের সময়। অনেক সময় মারূপ থেকে সাহায্য নিয়ে তারা প্রত্যেকে কিছু জিনিস কেনেন। যেমন বালতি কাপড় প্রভৃতি। কখনো কখনো রান্নার গ্যাস, টিভি, ফ্রিজ। বিয়ের পর চানুরা মারূপ থেকে মেয়েটির সদস্যপদ চলে যায়। কিছু কিছু চানুরা মারূপ লেইকাই অর্থাৎ আঞ্চলিক মারূপের সাথে সংঘবদ্ধ। সেক্ষেত্রে ঐ লেইকাই সদস্য-পরিবারের অবিবাহিত মহিলারা ৯-১০ বছর বয়স থেকেই ঐ চানুরা মারূপ-এর সদস্য, বাধ্যতামূলকভাবে। এই ধরনের চানুরা মারূপগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং খেলাধুলোর অনুষ্ঠানও সংগঠিত করে।

অবিবাহিতাদের মতো অবিবাহিত ছেলেদেরও সমবায় আছে। এবং তারও উত্থান মূলত বিয়ের খরচের কথা ভেবেই। নাম বর মারূপ, 'বর' মানে বাংলায় যা, মৈতেই ভাষাতেও তাই। চানুরা মারূপ-এর চেয়েও বর মারূপ বেশি প্রচলিত। বিয়ের খরচ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরই বেশি। বর মারূপ-এর সদস্যরা তাদের লুহোঙবা বা বিয়ের পরেও মারূপ-এর সদস্যই থাকে। অন্যদের সাহায্য করতে। বর এবং চানুরা মারূপ মূলত গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের উপর।

উপত্যকা সমাজের প্রথা অনুযায়ী কনিষ্ঠ বাদে বাকিদের বিয়ের পর আলাদা ঘর করে থাকতে হয়। নববিবাহিত দম্পতিদের নতুন গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় আরেকটি মারূপ-এর, ইয়ুমসা মারূপ।

অস্থায়ী মারূপগুলি মূলত আশু প্রয়োজনভিত্তিক এবং বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা প্রতিবেশ, অর্থনৈতিক সংযোগ প্রভৃতির উপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠা। অন্য দুটি মারূপও মূলত তাই। মারূপগুলি চলে সমস্ত মারূপ সদস্যের সম্মিলিত সভাগুলির মাধ্যমে। মারূপগুলির বিধিও তৈরি হয় সেখানেই। বিধি মানা হচ্ছে কিনা দেখাশোনা করার জন্য কোনও আইন ব্যবস্থা নেই। নেই কোনও রাষ্ট্রীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। প্রতিটি সদস্যর পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাসই এতদিন ধরে এত বিচিত্র এই সমবায় ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। মারূপ-এ সদস্যপদ পাবার পূর্বশর্ত সামাজিক সততা, কৌমের প্রতি দায়িত্ববোধ। কোনও একজন যদি কোনও একটা মারূপে বেইমানি করে, তবে ভবিষ্যতে অন্য কোনও মারূপে ঠাঁই পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। এইভাবেই ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিধর্মী ঋণ-ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুর ন্যায্যতাকে কাঁচকলা দেখিয়ে, মহাজনী ঋণযজ্ঞের (পুরনো এবং নতুন) আওতার বাইরে থেকে কৌমের সংঘবদ্ধতা এক সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে মণিপুরি উপত্যকায়। তা একই সাথে ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক। উপত্যকা সমাজের প্রতিটি পরিবার এবং বেশির ভাগ মানুষ অন্তত একটি মারূপ-এর সদস্য।

উপরোক্ত কথার বেশির ভাগই আমি পেয়েছি ভারতীয় যোজনা পরিষদের ঘুরাইজাম বিজয় কুমার সিং-এর লেখা একটি রিপোর্ট থেকে। শুনেছি, শুধু উপত্যকায় নয়, পার্বত্য মণিপুরের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলেরও আছে এরকম সমবায় উদ্যোগ। তবে তার সম্পর্কে বিশদ কিছু জানিনা।

জানিনা, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার অনুষঙ্গের প্রতি মণিপুরি সমাজের এই প্রত্যাখ্যানই রাষ্ট্রকে AFSPA প্রভৃতি দানবীয় আইনের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক হতে বাধ্য করেছে কিনা। হয়তো।

Regn.No.WBBEN/2000/3047

চিঠিপত্র

১. লেনিন-স্তালিনের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সম্পাদক

মন্থন

পি.এফ. ও ই.এস.আই.-এর কিছু সমস্যার সমাধানের খোঁজে দিল্লী যেতে হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। আশ্রয় নিয়েছিলাম 'অজয় ভবন'-এর ডরমিটরিতে। সারাদিন কাজের শেষে আমরা অজয় ভবনে ফিরে আসতাম রাতে। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিন বন্ধু, অর্থাৎ আমি, মলয় এবং আভায় নানান সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। ওই ঘরেই প্রায় মাথায় মাথায় বছর কুড়ি বয়সের দুই তরুণের দেখা পেলাম। ওদের পরনে জিন্‌স, কানে ওয়াকম্যানের জ্যাক, আবার ছোটো একটা বাইনাকুলার নিয়ে চারদিকে নজর করছে সদ্য কৈশোর পার হওয়া ছেলে-দুজন। ওরা খুব নীচু গলায় কথা বলছিল। তাই আমাদের কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছিল। ওদের উপস্থিতি তেমন টের পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎ বড়োটি এক রাতে আমাদের কাছে এসে সগর্বে ঘোষণা করল : "হমলোগ পার্টিমেম্বার হ্যায়।" জানিনা আমাদের কথাবার্তার কিছু ওর কানে গিয়েছিল কিনা, তবে ওর কথা বলার ধরনটা বেশ ভাল লাগল। ওদের দুজনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে জানতে পারলাম, ওরা মণিপুর থেকে এসেছে। বড়োটির নাম লেনিন, স্বাভাবিকভাবেই ছোটোর নাম স্তালিন। ওদের বাবা মণিপুরে সিপিআই-এর বড়ো নেতা। তিনি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। ছোটোটি দিল্লীতে থেকে পড়াশুনা করবে, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বড়ো মণিপুরেই ফিরে যাবে। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল না, বাবা পার্টি নেতা সেইজন্যই ওরা নিজেদের পার্টিমেম্বার মনে করছে, নাকি পার্টি খোদ ওদের মেম্বারশিপ দিয়েছে।

পরের রাতে আমিই উদ্যোগী হয়ে ওদের সাথে কথা শুরু করলাম। ততক্ষণে অবশ্য আমি ওদের আঙ্কেল হয়ে গেছি। বড়োটিই বেশি কথা বলছিল; ছোটোজন বড়োকে সমর্থন করে দু-এক কথাতেই কাজ সারছিল। কথা তুলেছিলাম মণিপুরে সিপিআই-এর সংগঠন ও তার অন্যান্য গণসংঠনের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই ওরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। সিপিআই মণিপুরীদের জাতিসত্তার লড়াইকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মনে করে। এটা লেনিন-স্তালিন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ওরা মনে করে মণিপুরীরা স্বাধীন জাতি, তাদের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে, সংস্কৃতি আছে। ইন্ডিয়ান আর্মি ওদের দাবিয়ে রেখেছে। সিপিআই মণিপুরীদের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়াকে সমর্থন করছে। সরকারি দলগুলিকে ওরা দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করে, এরা সকলে টাকা দিয়ে ভোট কেনে। এরা ড্রাগ মাফিয়াদের টাকা পায়। ড্রাগ মাফিয়ারা মণিপুরীদের সর্বনাশ করছে। সিপিআই কিছুই করতে পারবে না। কারণ সিপিআই-এর হাতে রাইফেল নেই। রাইফেল ছাড়া মণিপুরে কিছুই করা যাবে না। যদিও ওদের বাবা খুব ভাল লোক, তবু ওদের সাথে একটুও মতে মেলে না। খুব তর্ক হয়। লেনিন-স্তালিনের মার্কসবাদে একটুও উৎসাহ নেই। কারণ ওদের মতে মার্কসবাদ মণিপুরের কোনও কাজে লাগবে না। সেই ইন্ডিয়ার দালালিই হবে।

আমাদের আলাপ যখন বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল; শেষমেষ লেনিন তার গোপন সঙ্কল্পের কথা আমাদের জানাল। সে তার ভাইকে দিল্লীতে ভর্তি করে দিয়ে জঙ্গলে চলে যাবে, মণিপুরকে বাঁচাতে রাইফেল হাতে লড়বে। স্তালিন দৃঢ়ভাবে লেনিনের মতকেই সমর্থন করল। ওদের সব কথা মন দিয়ে শুনে আমি লেনিন-স্তালিনকে মার্কসবাদের প্রতি আস্থাশীল করে তোলার চেষ্টা করলাম। বুঝিয়ে বললাম, মার্কসবাদের সাথে মণিপুরীদের স্বার্থের কোনও বিরোধ নেই। আমি ওদের কাছে নকশাল আন্দোলনের কথাও তুলেছিলাম, বলেছিলাম নকশালরা মার্কসবাদী হয়েও জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছে। নকশাল আন্দোলনে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্পগুলো ওরা খুব মন দিয়ে শুনল। আমি ওদের সশস্ত্র সংগ্রামের সীমাবদ্ধতার দিকগুলিও বিস্তারিতভাবে বলেছিলাম। তারপর কথায় কথায় কেমনভাবে যেন আলোচনাটি একটি জাতির নবজাগরণ কীভাবে ঘটে সেই প্রসঙ্গে চলে গেল। ওরা তখন ওদের ভাষা ও লিপির কথা তুলল, ইতিহাসের গল্প শোনাল। আমি গণআন্দোলনের গুরুত্বের কথা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। ওরা সবই মন দিয়ে শুনল বটে, তবু বুঝলাম এই নবীন লেনিন রাষ্ট্রীয় রাজনীতিকে একমাত্র মনে করছে, রাইফেল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখছে।

আজ মণিপুরে একটা গণআন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনে লেনিন-স্তালিন কতখানি সক্রিয় তা অবশ্য আমি জানি না।

১০ অক্টোবর ২০০৪

গোবিন্দ চক্রবর্তী
হিন্দমোটর, হুগলি

২. মুর্শিদাবাদ থেকে মণিপুর

সম্পাদক

মন্থন পত্রিকা

মন্থন পত্রিকার মণিপুর বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে জানতে পেরে কয়েকটা কথা জানাবার ইচ্ছে হল।

জওহরলাল, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো নেতারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মতোই শক্ত লাগামে প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রীয় একটি সরকারের আয়ত্তে ও শাসনে রাখতে চেয়েছিলেন। যার জন্যই সংবিধানে ঠাঁই পেয়েছিল সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইনের মতো কালাকানুন। তারই জের ধরে আজ উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ মণিপুর সামরিক বাহিনীর বুটের তলায়। এদেশের মূলস্রোত থেকে জনসাধারণের একধরনের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে ওই রাজ্যগুলিতে।

অথচ ছোট্ট মণিপুর রাজ্য, বিশেষভাবে উপত্যকার বেশির ভাগ মানুষ শুধু শান্তিপ্রিয়ই নয়, তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ। এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকর্ষণের কারণেই বাঙলার মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে মণিপুরের আত্মিক যোগ গড়ে উঠেছিল। পার্শবর্তী নদীয়া জেলার সঙ্গে মণিপুরের বহুদিনের যোগাযোগ। মণিপুরের আন্দোলনের কথা তো পত্র-পত্রিকায় আসছে, আমি আমার জেলা মুর্শিদাবাদের সঙ্গে মণিপুরীদের আত্মিক সম্পর্কের কথা বলি।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া থেকে মণিপুরের রাজপরিবার বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং তা জনজীবনেও ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যে নৃত্যের জন্য মণিপুর জগদ্বিখ্যাত, সেই নৃত্যের উদ্ভাবক রূপকার ও প্রচারক ছিলেন

... পরবর্তী অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক সি-৫৬৪, ফতেপুর প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কলি-২৪ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট (দূরভাষ : ২২৪১-৪৫৭৭) কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক জিতেন নন্দী।

E-mail : jiten_nandi@vsnl.net, Telephone No. : 2491-3666